ছোটদের
মহাভারত
শ্রী খগেন্দ্র নাথ মিত্র

ছোটদের মহাভারত

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

[আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিশু-সাহিত্যিক ও বিভিন্ন শিশুগ্রন্থ প্রণেতা]

রঞ্জন প্রকাশন

৮/১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ছোটদের মহাভারত

অনেক কাল আগে দিল্লীর কাছে একটি সুন্দর নগর ছিল। নগরটির নাম ছিল হস্তিনাপুর। বিচিত্রবীর্য নামে খুব বড় একজন রাজা এই নগরে রাজত্ব করতেন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে তাঁর দুই ছেলে ছিল। ধৃতরাষ্ট্র জন্ম থেকেই ছিলেন অন্ধ। তাই রাজা বিচিত্রবীর্য মারা গেলে তিনি বড় ছেলে হয়েও রাজা হতে পারলেন না। লোকে তাঁর ছোট ভাই পাণ্ডুকে সিংহাসনে বসায়।

রাজা হতে পারলেন না বলে ধৃতরাষ্ট্রের মনে খুব দুঃখ। তবে আশা করলেন, নিজে সিংহাসনে না বসলেও তাঁর ছেলে হস্তিনাপুরের রাজা হবে। কিন্তু তাঁর কপালদোষে সে আশাও পূরণ হলো না। রাজা পাণ্ডুরই আগে ছেলে হলো। কাজেই পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁরই সিংহাসনে বসবার কথা। পাণ্ডুর এই ছেলেটির নাম রাখা হলো যুধিষ্ঠির। তিনিই হলেন ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ছেলেদের মধ্যে বড়।

রাজা পাণ্ডুর হলো পাঁচ ছেলে। আর, ধৃতরাষ্ট্রের হলো এক শ' ছেলে ও একটি মেয়ে। পাণ্ডুর ছেলে কয়টির নাম হলো যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। তাঁরা রূপে গুণে হয়ে উঠলেন সবার সেরা। আর ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের নাম হলো, দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি। এক একজনের এমনি ধরনের এক একটি বিদঘুটে নাম। তাঁরা সকলেই হয়ে উঠলেন শয়তানীতে সেরা।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন এক মায়ের ছেলে। তাদের মায়ের নাম কুন্তী। আর, নকুল ও সহদেবের মায়ের নাম মাদ্রী। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেমেয়ের মায়ের নাম গান্ধারী। গান্ধারীর এক ভাই ছিলেন। তাঁর নাম শকুনি। তিনি দুর্যোধনদের নানা কুমন্ত্রণা দিয়ে ঘরে-বাইরে অশান্তির সৃষ্টি করতেন।

পাণ্ডু ছিলেন কুরু বংশের রাজা। লোকে পাণ্ডুর ছেলেদের বলতো পাণ্ডব। আর, ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের বলতো কৌরব।

ছেলেগুলি একসঙ্গে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন।

পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের গুণ ও মিষ্টি ব্যবহারের জন্যে লোকে তাঁদের প্রশংসা করে, ভালবাসে। কৌরবদের তা সহ্য হয় না। তাঁরা হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরেন। আর, তাঁদের ক্ষতি করবার ফন্দি আঁটেন। ভীমের গায়ে সকলের চেয়ে জোর বেশি! তাই তাঁর ওপর কৌরবদের খুব রাগ।

এমন সময়ে রাজা পাণ্ডু মারা গেলেন। নকুল ও সহদেবের মা মাদ্রী দেবীও তাঁর সঙ্গে স্বর্গে চলে গেলেন। রাজকুমারেরা সকলেই তখন ছোট। যুধিষ্ঠিরেরই সিংহাসনে বসবার কথা। কিন্তু ছোট বলে রাজা হতে পারলেন না। জ্যেঠামহাশয় ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "যুধিষ্ঠির যতদিন বড় না হয় ততদিন আমিই ওর হয়ে রাজ্য চালাবো।" লোকে এই ব্যবস্থা মেনে নিল। তখন থেকে দুর্যোধনেরও দাপট বাড়লো।

পাণ্ডব ও কৌরবেরা এক সঙ্গে থাকেন। এক সঙ্গে খেলা করেন, লেখাপড়া ও যুদ্ধবিদ্যা শেখেন। পাণ্ডবেরা মন দিয়ে শেখেন বলে লেখাপড়ায় ও অস্ত্র চালানোয় হয়ে উঠলেন কৌরবদেরও সেরা। ভীম আবার গদাযুদ্ধে ও কুস্তিতে সবাইকে হারিয়ে দেন!

দুর্যোধনেরা একদিন গোপনে পরামর্শ করতে লাগলেন, কী করে ভীমকে মেরে ফেলা যায়। ভীম বড় হলে কেউ ওঁর সঙ্গে পারবে না। তাই ভীমকে এখনই মেরে ফেলতে হবে! ভীম যদি মরে যান তাহলে যুধিষ্ঠিরকে সহজেই তাড়িয়ে দিয়ে হস্তিনাপুরের সিংহাসন দখল করা যাবে।

এই রকম কুপরামর্শ করে একদিন গঙ্গাস্নানে গিয়ে দুর্যোধন ভীমকে সন্দেশের সঙ্গে বিষ খাওয়ালেন। বিষের ঘোরে ভীম অজ্ঞান হয়ে পড়লে কৌরবেরা তাঁকে জলে ফেলে দিলেন। মনে করলেন, তাঁদের শত্রু নিপাত হলো।

কিন্তু এতে ফল হলো উল্টো। ভীম ডুবতে ডুবতে গিয়ে পড়লেন পাতালে সাপদের রাজ্যে। সাপেরা তাঁকে পেয়েই কামড়াতে লাগলো। তাদের কামড়ে ভীমের গা হলো নির্বিষ। সাপদের রাজা বাসুকী তাঁকে চিনতে পেরে খুব আদর-যত্ন করে অমৃত খেতে দিলেন। অমৃত খেয়ে ভীমের গায়ে হলো দশ হাজার হাতীর শক্তি! তিনি ফিরে এলেন বাড়িতে। যুধিষ্ঠিররা এই ঘটনা থেকে বুঝতে পারলেন, কৌরবেরা তাঁদের সর্বনাশ করতে চান। তাঁরা তখন থেকে সাবধান হয়ে গেলেন। কিন্তু ঘরে শত্রু থাকলে রক্ষা পাওয়া কঠিন। দুর্যোধনেরা তাঁদের কী অনিষ্ট করলেন তা পরে বলছি।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর এক জ্যেঠামশাই ছিলেন। তাঁর নাম দেবব্রত। কিন্তু তিনি এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলে তাঁর আর এক নাম হয়েছিল, ভীষ্ম। তিনি বর পেয়েছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা না করলে তাঁর মৃত্যু হবে না। ভীষ্ম ছিলেন মহাবীর ও মহাজ্ঞানী। সম্পর্কে তিনি পাণ্ডব ও কৌরবদের পিতামহ। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের হয়ে রাজ্যশাসন করলেও তিনিই ছিলেন সকলের অভিভাবক।

ভীষ্মের ইচ্ছা ভরদ্বাজ মুনির ছেলে দ্রোণ পাণ্ডব ও কৌরবদের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। রাজকুমারেরা কৃপাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখলেও তিনি অস্ত্রবিদ্যায় দ্রোণাচার্যের সমান ছিলেন না। দ্রোণাচার্যের খুব নাম ছিল।

শেষে একদিন দ্রোণাচার্য নিজেই এলেন হস্তিনাপুরে। প্রথমে কেউ তাঁকে দ্রোণাচার্য বলে চিনতে পারলেন না! রাজকুমারেরা তখন এক জায়গায় একটি লোহার গোলা নিয়ে খেলা

করছেন। খেলা করতে করতে গোলাটি হঠাৎ এক কূয়ায় পড়ে। রাজকুমারেরা তখন বলটিকে ওপরে তুলে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু পারলেন না। এমন সময়ে দ্রোণাচার্য সেখানে এসে পড়লেন।

তিনি তাই দেখে বললেন, "ক্ষত্রিয়ের ছেলে হয়ে তোমরা গোলকটিকে কূয়া থেকে তুলতে পারছো না ? এই দেখ, আমি তুলছি।"—এই বলে তিনি একটা শক্ত শর দিয়ে গোলাটাকে বিঁধলেন। তারপর সেই শরের পিছনে একটি শর, তার পিছনে আর একটি শর, এমনি করে পর পর কয়েকটি শর বিঁধে, শেষের শরটি ধরে গোলাটা তুলে আনলেন। তারপর বললেন, "এই দেখ এটাও তুলে আনছি।"—এই বলে নিজের আঙ্গুলের আংটি কূয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে ঐভাবে তুলে আনলেন। তাই দেখে রাজকুমারেরা তো অবাক !

এই খবর নিমেষে চারধারে ছড়িয়ে পড়লো। ভীষ্ম শুনলেন। শুনে বুঝলেন, এ কাজ এক দ্রোণাচার্য ছাড়া আর কেউ পারে না। তিনিই এসেছেন। ভীষ্ম খুব খুশী হয়ে দ্রোণাচার্যকে আদর করে এনে তাঁর হাতে রাজকুমারদের অস্ত্রবিদ্যা শিখানোর ভার দিলেন।

দ্রোণাচার্যও রাজকুমারদের শিষ্য করতে পেরে খুব আনন্দিত হলেন। তাঁদের বললেন, "বৎসগণ ! আমি তোমাদের এমন অস্ত্রবিদ্যা শেখাবো যে তোমাদের সমান কেউ হতে পারবে না। শেষে কিন্তু আমার একটি কাজ তোমাদের করে দিতে হবে।"

অর্জুন বললেন, "বলুন কী করতে হবে ? আপনার আজ্ঞা নিশ্চয়ই পালন করবো !"

খুশী হয়ে দ্রোণাচার্য বললেন, "পরে বলবো।"

তারপর থেকে তিনি কুমারদের অস্ত্রবিদ্যা শিখাতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কৌরবদের বন্ধু কর্ণ। তিনি বয়সে কুমারদের সকলের বড়। লোকে জানতো তিনি অধিরথ নামে এক সারথির ছেলে। কিন্তু তিনি আসলে ছিলেন যুধিষ্ঠিরদের বড় ভাই। এই কথা তাঁদের মা কুন্তী দেবী ছাড়া আর কেউই জানতো না ! কর্ণ নিজেও অনেকদিন জানতে পারেন নি।

দ্রোণের শিক্ষার গুণে দুর্যোধন ও ভীম গদায় নকুল ও সহদেব তলোয়ারে আর অর্জুন তীর-ধনুক চালানোয় হয়ে উঠলেন সকলের সেরা। যেমন দ্রোণ, তেমনি অন্যেও তাঁদের অস্ত্রশিক্ষার প্রশংসা করেন। দ্রোন আবার তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অর্জুনকে ভালবাসেন খুব বেশি। তাই দেখে দুর্যোধন হিংসায় জ্বলে পুড়ে যান। দোণাচার্য একদিন অর্জুনকে বললেন, "বৎস ! তোমাকে আমি তীর-ধনুক চালানোর এমন সব কৌশল শিখাবো যে পৃথিবীর কেউ তোমার সঙ্গে পারবে না।"

দ্রোণাচার্য তাঁর কথাও রেখেছিলেন। অর্জুনের সমান বীর পৃথিবীতে ছিল না।

একদিন দ্রোণাচার্য তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কে কী রকম তীর-ধনুক চালানো শিখেছেন তা পরীক্ষার জন্য একটি নীল রঙের পাখি তৈরি করিয়ে একটি গাছের ডালে বসিয়ে দিলেন।

তারপর কুমারদের বললেন, "গাছের ডালে ঐ যে নীল পাখিটি দেখছো ওটার মাথা কেটে মাটিতে ফেলতে হবে। যে পারবে বুঝবো তার শিক্ষা ঠিক মতো হয়েছে।"

তাই শুনে কুমারেরা উৎফুল্ল হলেন।

দ্রোণাচার্য প্রথমে ডাকলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির তীর-ধনুক হাতে এগিয়ে এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গাছের ডালে কী দেখছো?"
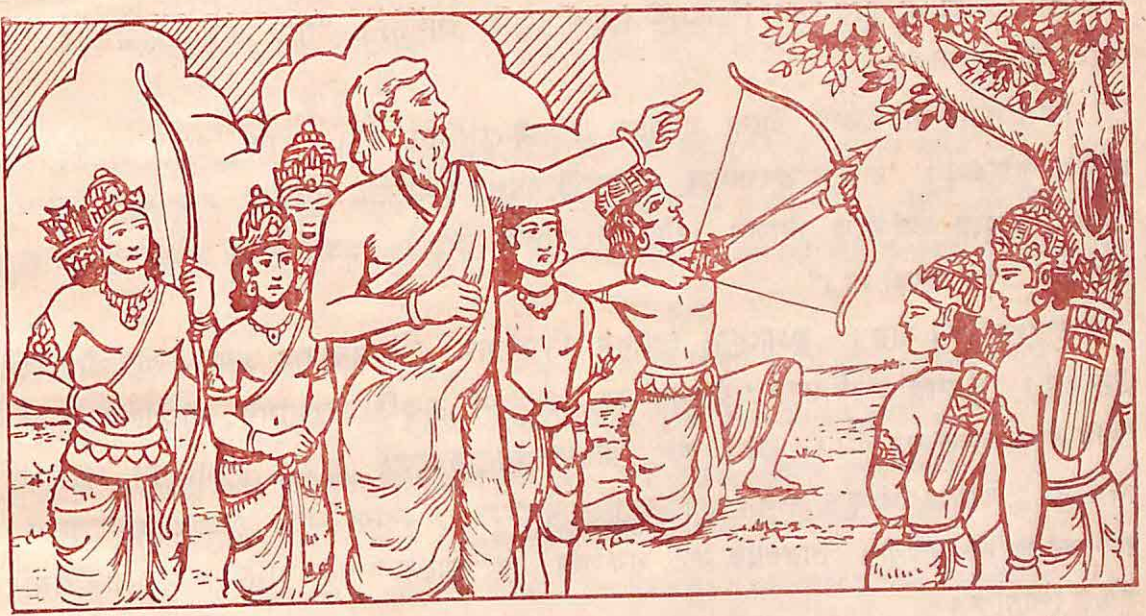
"গাছের ডালে ঐ যে নীল পাখিটি দেখছো ওটার মাথা কেটে মাটিতে ফেলতে হবে।"

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, "একটা পাখি।"

দ্রোণ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কী দেখতে পাচ্ছো?"

যুধিষ্ঠির জবাব দিলেন, "গাছের ডালপালা দেখতে পাচ্ছি। আপনাদেরও দেখছি।"

তাই শুনে দ্রোণ বললেন, "পাখিটার মাথা কেটে ফেলা তোমার কর্ম নয়। তোমার নজর ঠিক হয় নি। সরে যাও।"

তারপর তিনি কুমারদের সকলকেই একে একে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু কেউই তাঁর মনের মতো উত্তর দিতে পারলেন না। তাই তাঁদের সরিয়ে দিলেন। শেষে ডাকলেন অর্জুনকে।

অর্জুন তীর-ধনুক হাতে এগিয়ে এলে দ্রোণাচার্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল দেখি বৎস গাছের ডালে কী দেখছো ?"

অর্জুন বললেন, "একটি পাখির মাথা।"

শুনে দ্রোণ খুশী হলেন। বললেন, "মাথাটি তীর দিয়ে কেটে ফেল।"

তাঁর মুখের কথা শেষ না হতেই অর্জুনের তীর ছুটে গিয়ে পাখিটার মাথা কেটে ফেললো।

তারপর আর একদিন দ্রোনাচার্য শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গাস্নানে গেলেন। জলে নেমে স্নান করতে করতে দ্রোণকে ধরলো এক কুমীর। দ্রোণ ইচ্ছা করলে কুমীরটাকে মেরে ফেলতে পারতেন। তা না করে তিনি শিষ্যদের ডেকে বলতে লাগলেন, "শীঘ্র আমায় কুমীরের মুখ থেকে বাঁচাও।"

কিন্তু কুমারেরা কেউ তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলেন না। তাঁরা ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন! অর্জুন তৎক্ষণাৎ কয়েকটি বাণে কুমীরের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। দ্রোণ খুশী হয়ে অর্জুনকে দিলেন এক সাংঘাতিক অস্ত্র। অস্ত্রটি দিয়ে বললেন, "এ অস্ত্র মানুষের ওপর ছেড়ো না।"

তারপর দিন যায়। কুমারেরা দ্রোণের শিক্ষাগুণে এক একজন এক একটি বীর হয়ে উঠলেন। তাঁদের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষার জন্যে একদিন একটি উৎসবের আয়োজন হলো। তৈরি হলো মস্ত রঙ্গভূমি। ভীষ্ম, কৃপ, রাজবাড়ির সকলেই এলেন কুমারদের অস্ত্রখেলা দেখতে। বাইরে থেকেও এলেন কত রাজা-মহারাজা ও লোকজন। বাজতে লাগলো কত রকমের বাদ্যি-বাজনা। চারধারে কত রকমের ফুল-ঝালর-নিশান-মালা। সকলের পরণে সুন্দর পোশাক।

দেবতাদের পূজা করে শুরু হলো খেলা। গদা হাতে এলেন ভীম ও দুর্যোধন। দুজনেই বীর। দুজনে খেলতে লাগলেন নকল যুদ্ধের খেলা! কিন্তু খেলতে খেলতে দুজনেরই রক্ত এমন গরম হয়ে উঠলো যে, দু ভাইয়ে আসল যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। দ্রোণাচার্য তাঁদের তৎক্ষণাৎ থামিয়ে না দিলে হতো এক বিষম কাণ্ড।

সকলের শেষে তীর-ধনুকের খেলা দেখাতে এলেন অর্জুন। তাঁর খেলা দেখে সভার সকলে অবাক। সকলে তাঁকে "ধন্য ধন্য" করতে লাগলেন।

এমন সময়ে মহা শব্দ করে রঙ্গভূমিতে এলেন কর্ণ। তিনি এসেই অর্জুন যে সব আশ্চর্য খেলা দেখিয়ে লোকের প্রশংসা পেয়েছিলেন সে সব খেলাই দেখালেন। এতক্ষণ অর্জুনের খেলা দেখে ও প্রশংসা শুনে দুর্যোধন মুখ ম্লান করে বসেছিলেন।

তারপর কর্ণ যেমনি বললেন, "আমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি"। অমনি দুর্যোধনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি ও কর্ণ দুজনে মিলে পাণ্ডবদের গালাগাল দিতে লাগলেন। তাই শুনে অর্জুন গেলেন ক্ষেপে। তিনিও কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেলেন। সভায় কেউ নিলেন অর্জুনের পক্ষ, কেউ নিলেন দুর্যোধনের। ভীষ্ম, দ্রোণ ও আর সকলে তাই দেখে ভয় পেলেন। দুই ছেলে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ক্ষেপে উঠেছে দেখে কুন্তী দেবী অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তবু কী অর্জুন ও কর্ণ শান্ত হন?

তখন কৃপাচার্য কর্ণকে বললেন "তুমি তো রাজার ছেলের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছো। বল তো বাপু, তুমি কোন্ রাজার ছেলে?"

তাই শুনে কর্ণের মাথা হেঁট হয়ে গেল। সত্যি তো তিনি কোন রাজার ছেলে নন।

তখন দুর্যোধন বললেন, "রাজা না হলে যদি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা না যায় তবে আমি ওকে এখনই রাজা করে দিচ্ছি!" এই বলে তিনি কর্ণকে অঙ্গ দেশের রাজা করে দিলেন।

কর্ণ খুশী হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, "বন্ধু! আমি চিরদিন তোমারই রইলাম।"

দুর্যোধন বললেন, "তোমায় যখন পেয়েছি তখন পাণ্ডবদের আর গ্রাহ্যই করি না।'

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসায় সব শান্ত হলো। সভা শেষে সকলে চলে গেলেন।

কুমারদের পরীক্ষা তো হলো। কিন্তু গুরুদক্ষিণা দেওয়া যে বাকি।

পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদ ও দ্রোণাচার্য ছেলেবেলায় পরস্পরের বন্ধু ছিলেন। এক সঙ্গে খেলা করতেন, এক সঙ্গে বেড়াতেন। কিন্তু দ্রুপদ বড় হয়ে সিংহাসনে বসে ছেলেবেলার কথা ভুলে গিয়ে দ্রোণাচার্যকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। সেদিনকার কথা দ্রোণাচার্য ভুলতে পারেন না। তাই দ্রোণ রাজকুমারদের বললেন, "তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে ধরে এনে আমায় দাও। তাই আমার গুরুদক্ষিণা!"

তাই শুনে কৌরবেরা ছুটলেন দ্রুপদকে ধরতে। কিন্তু পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ছিলেন বীর। তাঁর সৈন্যেরা তাঁদের হারিয়ে দিলে। হেরে গিয়ে দুর্যোধনেরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পথ পান না।

তখন দ্রোণাচার্য পঞ্চপাণ্ডবদের নিয়ে গেলেন সেখানে! ভীম-অর্জুন এমন যুদ্ধ করলেন যে, রাজা দ্রুপদ হেরে গেলেন। অর্জুন তাঁকে বন্দী করে দ্রোণাচার্যের কাছে এনে দিলেন।

দ্রোণাচার্য কিন্তু দ্রুপদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেন না। তিনি দ্রুপদকে বললেন, "দ্রুপদ! আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু পাছে তোমার ছেলেবেলার বন্ধুকে আবার ভুলে যাও, তাই তোমার অর্ধেক রাজ্য আমি নিলাম। বাকি অর্ধেক তোমারই রইলো।"

দ্রুপদ মাথা নিচু করে রইলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কথা সরলো না। কিন্তু মনে মনে বললেন, "এ অপমানের শোধ নেবোই!"

তারপর দিনে দিনে কত বছর গেল। পাণ্ডব ও কৌরবেরা বেশ বড় হয়ে উঠছেন। লোকে পাণ্ডবদের গুণগান করে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দেখলেন, লোকে চায় যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসুন। তাই তাঁকে করলেন, যুবরাজ।

পাণ্ডবরা এমন ভাবে রাজ্য চালাতে লাগলেন যে, লোকে তাঁদের জয়গান করতে লাগলো। তাতে ধৃতরাষ্ট্র ভয় পেলেন আর দুর্যোধনেরা হিংসায়, দুঃখে সারা হতে লাগলেন। তাঁরা ভাবলেন, এখনই পাণ্ডবদের ফেলা দরকার। আরও বড় হলে ওদের সঙ্গে কিছুতেই পারা যাবে না।

তাঁরা পরামর্শ করতে লাগলেন, কী উঁপায়ে পাণ্ডবদের মেরে ফেলা যায়। হস্তিনাপুর থেকে কিছুদূরে ছিল বারণাবত নামে এক নগর। কৌরবেরা ঠিক করলেন, পাণ্ডবদের সেখানে পাঠিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে হবে। মন্ত্রী পুরোচন আগে সেখানে গিয়ে গালা, পাট, শণ, ঘি প্রভৃতি সহজেই পোড়ে এমন সব জিনিষ দিয়ে একখানি বাড়ি তৈরি করে রাখবে। পাণ্ডবেরা বারণাবতে বেড়াতে গেলে ঐ বাড়িতে থাকবেন। তারপর সুবিধামতো একরাতে তাতে আগুন দিয়ে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারা হবে। পরামর্শ খুব গোপনে হলেও তাঁদের কাকা বিদুর তা জানতে পারলেন। তিনি অমনি গিয়ে পাণ্ডবদের সাবধান করে দিলেন।

তারপর ধৃতরাষ্ট্র শিবপূজার ছুতো করে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীকে পাঠালেন বারণাবত নগরে। তাঁরা গিয়ে পুরোচনের তৈরী সেই গালার বাড়িতে রইলেন। বারণাবতের লোকেরা তাঁদের পেয়ে খুব খুশী হলো। দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। বিদুর গোপনে একটি লোককে পাণ্ডবদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে মাটির নিচে এমন একটি সুড়ঙ্গ কেটে দিয়েছিল যে, ঘরে আগুন লাগলে তার মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে বাইরে

বেরিয়ে যাওয়া যায়। ভীম তার মধ্য দিয়ে গিয়ে বাইরে বন-জঙ্গল ও পথঘাট বেশ করে চিনে এলেন।

তারপর এক রাতে কুন্তী এক ব্রত উপলক্ষে বামুন-ভোজন করালেন। এক নিষাদী ও তার পাঁচ ছেলেও তার সঙ্গে এসে এমন খাওয়া খেলো যে উঠে দাঁড়াতে পারলো না। সেখানে পড়ে ঘুমোতে লাগলো। পাণ্ডবেরা জানতেন পুরোচন সেই রাতেই ঘরে আগুন দেবে। তাই তাঁরা সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু গভীর রাতেও যখন সে এলো না তখন ভীম গিয়ে তারই ঘরে আগুন দিলেন। তারপর সেই গালার বাড়িতে আগুন দিয়ে কুন্তী দেবীকে কাঁধে, নকুল ও সহদেবকে কোলে নিয়ে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের হাত ধরে টানতে টানতে সেই সুড়ঙ্গ-পথে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন।

এদিকে পুরোচন পুড়ে মারা গেল। সেই ঘুমন্ত নিষাদী ও তার পাঁচটি ছেলেও পুড়ে ছাই হলো। তাদের পোড়া দেহ দেখে বারণাবতের লোকেরা মনে করলো, কুন্তী দেবী ও পঞ্চপাণ্ডব পুড়ে মরেছেন। তারা হাহাকার ক'রে কাঁদতে লাগলো। আর পুরোচন পুড়ে মরার সময় সকলেই বলতে লাগলো, "শয়তানটার উচিত শাস্তি হয়েছে।"

এই খবর গিয়ে পৌছলো হস্তিনায়। শুনে দুর্যোধনেরা হলেন খুশী। ধৃতরাষ্ট্র লোক দেখানো চোখের জল ফেললেন। মিন্তু মনে মনে বললেন, "আপদ গেল।" দুর্যোধনেরা যাতে সন্দেহ না করেন সেজন্যে বিদুরও লোক দেখানো কাঁদলেন।

ভীম সকলকে নিয়ে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে বনপথে ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গাতীরে এসে পৌঁছলেন। গঙ্গা পার হয়ে আবার চলতে লাগলেন। দুর্যোধনদের ভয়ে কোথাও দাঁড়াতে সাহস হয় না। তাঁর কাঁধে মা কুন্তী দেবী, কোলে নকুল ও সহদেব, আর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসছে। কিন্তু কোথাও জলাশয়ের চিহ্ন নেই! শেষে সন্ধ্যার পর এক জায়গায় সারসের ডাক শুনে বুঝলেন, কাছেই জলাশয় আছে। মা ও ভাইদের একটি গাছতলায় বিশ্রাম করবার জন্য রেখে ভীম গেলেন জলাশয়ে জল আনতে। জল নিয়ে ফিরে এসে দেখেন, সকলে ঘুমোচ্ছেন। ভীম জল রেখে তাঁদের গাহারা দিতে লাগলেন।

এখন, সেই বনে থাকতো হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস। সে পাণ্ডবদের গন্ধ পেয়ে তার বোন হিড়িম্বাকে বললো, "এক্ষুনি গিয়ে ওদের ঘাড় মট্‌কে রক্ত খা।"

দাদার কথায় হিড়িম্বা ছুটে এলো বটে ; কিন্তু সে ভীমকে দেখে ভুলে গেল। সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে সে ভীমের কাছে গিয়ে বললে, "আমায় বিয়ে করো। তাহলে আমার দাদার হাত থেকে তোমাদের বাঁচাবো।"
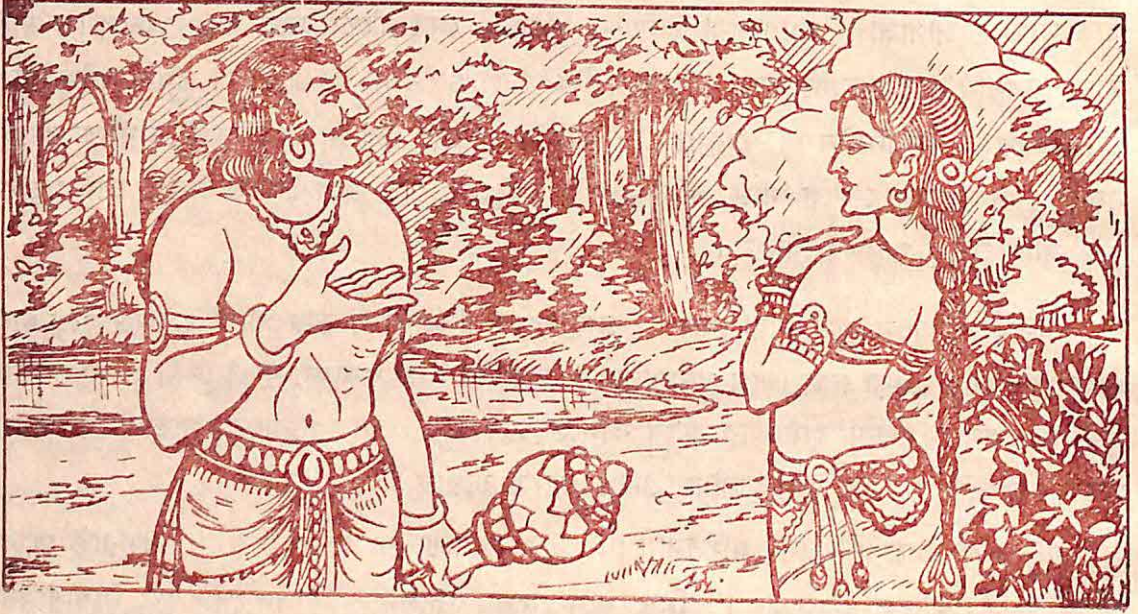
"আমায় বিয়ে করো। তাহলে আমার দাদার হাত থেকে তোমাদের বাঁচাবো।"

ভীম তার কথায় রাজী হলেন না! সেও ছাড়ে না।

এদিকে হিড়িম্বের আর দেরী সয় না। সে বোনের দেরী দেখে চীৎকার করতে করতে ছুটে এলো। ভীম বললেন, "চুপ! আমার মা, ভাইয়েরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন। ওঁদের ঘুম ভেঙে যাবে।"

রাক্ষস সে কথা কানেই তোলেনা। তখন ভীম তাকে ধরলেন জাপটে। শুরু হলো লড়াই। ভীম তাকে ঠেলতে ঠেলতে খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে ভীষণ লড়াই করতে লাগলেন। শেষে তাকে তুলে দিলেন এক আছাড়। তাতে হিড়িম্বের পিঠের হাড় মট্ করে ভেঙে গেল। আর তাঁদের যুদ্ধের দাপাদাপিতে সকলে জেগে উঠলেন।

হিড়িম্বাকে দেখে আর তার মুখে সব কথা শুনে কুন্তী দেবী ও যুধিষ্ঠির খুশী হলেন।

ভীমের সঙ্গে তাঁরা তার বিয়ে দিলেন। হিড়িম্বার একটি ছেলে হলো। তার নাম রাখা হলো ঘটোৎকচ। সে জন্মেই বললে, "বাবা, আমি এখন চললাম। দরকার হলে আমায় ডাকলেই আসবো।"

পাণ্ডবেরা সেখানে কিছুদিন থেকে আবার বনে বনে ঘুরতে লাগলেন। কৌরবদের ভয়ে এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে পারেন না। দুর্যোধনের লোকদের হাতে পাছে ধরা পড়েন এজন্য তাঁরা তপস্বীর বেশ ধরলেন। নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে এলেন একচক্রা নগরে। উঠলেন এক বামুনের বাড়ি।

তারপর বামুনের বাড়ি থাকেন। পাঁচ ভাই সারা দিন নগরে ভিক্ষা করেন। সন্ধ্যায় ফিরে এসে ভিক্ষায় যা পান মাকে দেন। মা সেই ভিক্ষার চালে ভাত রেঁধে দুই সমান ভাগ করেন। তার এক ভাগ ভীমের, বাকী ভাগ আর সকলের।

একদিন চার ভাই গেলেন ভিক্ষায়। বাড়ি রইলেন কেবল কুন্তীদেবী ও ভীম। এমন সময়ে বামুনের বাড়িতে কান্নার রোল উঠলো। কান্না শুনে কুন্তী বাড়ির ভিতর গিয়ে দেখেন, বামুন-বামনী ও তাঁদের দুই ছেলে-মেয়ে মাটিতে লুটিয়ে কাঁদছেন।

কুন্তী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কাঁদছেন কেন?"

বামুন বললেন, "এই নগরে বক নামে একটা রাক্ষস আছে। তাকে রোজ পালা করে নানা রকমের খাবার আর একটি করে মানুষ যোগাতে হয়। সে সেইসব খাবার আর মানুষটাকে খেয়ে ফেলে। কাল আমাদের পালা পড়েছে। কে সেই খাবার তার কাছে নিয়ে যাবে এই ভেবে আমরা কাঁদছি। খাবার না পাঠালে সে এসে আমাদের সবাইকে খেয়ে ফেলবে।"

কুন্তী বললেন, "আপনারা শান্ত হোন! কাল আমার একটি ছেলে তার কাছে খাবার নিয়ে যাবে।"

তা শুনে বামুন-বামুনী শান্ত হলেন না, "তা কেমন করে হবে? আপনারা আমাদের অতিথি। তার কাছে গেলে সে আপনার ছেলেটিকেও খেয়ে ফেলবে।"

কুন্তী দেবী বামুনকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করলেন। তাঁর কথায় নানা রকমের খাবার তৈরী করতে লাগলেন।

পরদিন ভীম সেই সব চমৎকার খাবার নিয়ে চললেন বকের কাছে। তিনি জঙ্গলে ঢুকতেই ভীষণ শব্দ শুনতে পেলেন। কিন্তু ভীমের ভয়-ডর কিছু নেই। অনেক দিন

তেমন ভাল খাবার তিনি খান নি! তাই বককে কয়েকবার ডেকে সেই সব খাবার খেতে বসে গেলেন!

এদিকে ক্ষিদেয় বকের পেট জ্বলছে। সে ভীমের ডাক শুনে ছুটে এসে ভীমের কাণ্ড দেখে ক্ষেপে উঠলো। বললে, "তোর এতবড় স্পর্ধা!" বলেই ভীমকে মারতে লাগলো। ভীম তাতেও একটুও কাতর হলেন না, যেমন খাচ্ছিলেন তেমনি খেতে লাগলেন। খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে এসে বকের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিলেন। সে লড়াইয়ের কথা আর কী বলবো? দুজনেরই গায়ে হাতীর মতো জোর। কাজেই লড়াই যে কী ভয়ঙ্কর হলো বুঝতেই পারছো। শেষে ভীম তার চুলের ঝুঁটি ধরে কয়েকটা ঘুরপাক খাইয়ে তুলে আছাড় দিতে লাগলেন। আছাড়ে রক্ত বমি করতে করতে রাক্ষসটা গেল মরে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে পাণ্ডবেরা এক বামুনের মুখে খবর পেলেন, পাঞ্চাল-দেশের রাজা দ্রুপদের মেয়ে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর হবে। মেয়েটি পরমাসুন্দরী। তাঁর গুণের শেষ নেই। তবে মেয়েটির গায়ের রঙ কালো। তাই তাঁর আর এক নাম, কৃষ্ণা।

খবরটি শুনে আর ব্যাসদেবের পরামর্শে পাণ্ডবেরা একদিন চললেন পাঞ্চাল দেশে। পথে চিত্রসেন নামে এক গন্ধর্বের সঙ্গে তাদের বিবাদ বাধলো। কিন্তু অর্জুন লড়াই করে তাকে এমন শিক্ষা দিলেন যে, সে কেঁদে কূল পায় না। শেষে যুধিষ্ঠিরের দয়ায় সে মুক্তি পেয়ে অর্জুনকে একটি অদ্ভুত বিদ্যা শিখিয়ে দিলে। আর দিলে একশ' ঘোড়া। অর্জুনও তাকে দিলেন ব্রহ্মাস্ত্র।

নগরে পৌঁছে তারা উঠলেন এক কুমোরের বাড়ি।

স্বয়ংবরের জন্যে নগরে তখন মহা ধূমধাম। কত দেশ থেকে এসেছেন কত রাজা, মহারাজা ও রাজকুমারেরা। আর এসেছে নানা রকমের লোক। সকলেরই ইচ্ছা, দ্রৌপদীকে বিয়ে করেন। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর বিয়ে হবে না। দ্রুপদ যে লক্ষ্য তৈরি করেছেন সেটি বিধতে পারলে তবেই দ্রৌপদী তাঁর গলায় মালা দেবেন।

লক্ষ্যটি আবার সামান্য নয়। শূন্যে ঝুলছে একটা মাছ। তার নিচে ঘুরছে একখানা চাকা। মাটিতে রয়েছে জল। জলে পড়েছে তার পরিষ্কার ছায়া। দ্রুপদেরই দেওয়া ধনুকে গুণ পরিয়ে সেই ছায়া দেখে মাছটির চোখ তীর দিয়ে বিঁধতে হবে। বুঝতে পারছো কাজটি কি কঠিন!

যাহোক, স্বয়ংবর সভা তো বসেছে। সভায় দুর্যোধন, কর্ণ, জরাসন্ধ ও আরো কত

নামকরা রাজা-মহারাজা বামুন-ক্ষত্রিয় বসে আছেন। পঞ্চপাণ্ডবও বামুনের বেশে এক ধারে গিয়ে বসলেন। দ্রৌপদী এলেন মালা হাতে।

শুরু হলো লক্ষ্যভেদ করার পালা। কিন্তু লক্ষ্যভেদ করা তো দূরের কথা অনেকে সেই ধনুকখানি বাঁকাতেই পারলেন না। যাঁরা গুণ পরিয়ে সেই ধনুকে তীর দিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে গেলেন তাঁরা লজ্জায় মাথা হেঁট করে ফিরে গেলেন। দম্ভ করে এগিয়ে গেলেন কর্ণ। দ্রৌপদী অমনি বললেন, "আমি সারথির ছেলের গলায় মালা দেবো না।"

তাই শুনে কর্ণ লজ্জায় ফিরে এলেন।

সভায় দ্বারকা থেকে এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম। পাণ্ডবেরা আড়ালে বসে থাকলেও তাঁরা দু-ভাই তাঁদের চিনতে পারলেন। কিন্তু কাউকে সে কথা বললেন না।

স্বয়ংবর সভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদ।

এদিকে কেউই যখন লক্ষ্যভেদ করতে পারলেন না তখন যুধিষ্ঠির অর্জুনকে লক্ষভেদ করবার জন্য ইসারা করলেন। অর্জুন উঠে সেই ধনুকখানির দিকে এগিয়ে যেতেই

অনেকে তাঁকে বারণ করতে লাগলো। কিন্তু অর্জুন সে সব গ্রাহ্য না করে খুব সহজেই ধনুকে গুণ পরিয়ে লক্ষ ভেদ করলেন।

সভায় অর্জুনের জয়ধ্বনি উঠলো। শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে পাণ্ডবদের মামাতো ভাই হতেন। তার ওপর ছিলেন অর্জুনের সখা। তিনি অর্জুনের জয়ে খুবই খুশী হলেন। দ্রৌপদী এসে অর্জুনের গলায় বিজয়মালা পরিয়ে দিলেন। কিন্তু যে-সব রাজা-মহারাজা লক্ষ্যভেদ করতে পারেন নি তাঁরা গেলেন ক্ষেপে। বললেন, "একটা সামান্য বামুন এসে দ্রৌপদীকে নিয়ে যাবে? কিছুতেই তা হতে দেবো না।"

তাঁরা সকলে অর্জুন ও রাজা দ্রুপদকে আক্রমণ করলেন। ভীমও অমনি লাফিয়ে উঠে একটা মস্ত গাছ উপড়ে এনে রাজাদের বিষম পিটতে লাগলেন। তাঁদের দুর্দশার একশেষ হতে লাগলো। তাঁরা ভাবতেই পারেন নি যে এমন হবে। শ্রীকৃষ্ণ শেষে ব্যাপারটা দিলেন থামিয়ে।

তারপর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে বাড়ি চললেন। সন্ধ্যা হয়ে এলো। ছেলেরা বাড়ি ফিরলো না দেখে কুন্তী দেবী খুব চিন্তায় ছিলেন। এমন সময়ে ছেলেরা বাড়ি এসে বাইরে থেকে বললেন, "মা! আজ কী আশ্চর্য জিনিষ এনেছি দেখ!"

কুন্তী অতশত না ভেবেই বললেন, "বাবারা, যা এনেছো তা তোমাদের পাঁচজনের থাক।"

মায়ের কথা শুনে পাণ্ডবেরা মহা ভাবনায় পড়লেন। এখন উপায় কী? এদিকে মাতৃ-আজ্ঞা পালন না করলে মহা অন্যায় হবে যে! শেষে পাঁচজনেই দ্রৌপদীকে বিয়ে করলেন।

রাজা দ্রুপদ কিন্তু মহা ভাবনায় পড়েছিলেন। তিনি বুঝতেই পারছিলেন না দ্রৌপদী কার হাতে পড়লেন। তাঁর মনে মনে ইচ্ছা ছিল, অর্জুনের সঙ্গে তাঁর মেয়েটির বিয়ে হয়। যাহোক, শেষে খবর পেলেন যে, দ্রৌপদী পাণ্ডবদের হাতেই পড়েছেন। তবে শুনলেন তাঁকে পাঁচ ভাই বিয়ে করেছেন। কথাটা তাঁদের কারোই ভাল লাগলো না। তখন হঠাৎ ব্যাসদেব এসে দ্রুপদকে বললেন, "দ্রৌপদী শিবের বরে পাঁচজন গুণবান পতি লাভ করেছেন। তার ওপর মাতৃ-আজ্ঞা। আপনি ওদের বিয়ের আয়োজন করুন।"

রাজা দ্রুপদ খুব ধুমধাম করে পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে দৌপদীর বিয়ে দিলেন। বিয়ের খবর গিয়ে পেঁছালো হস্তিনায়। খবর শুনে ধৃতরাষ্ট্র মনে করলেন, দুর্যোধনের সঙ্গেই বুঝি দ্রৌপদীর বিয়ে হয়েছে। তাই প্রথমে তাঁর ভারি আনন্দ হলো। কিন্তু যখন তিনি শুনলেন, পাণ্ডবেরা

দ্রৌপদীকে বিয়ে করেছেন তখন তাঁর খুব দুঃখ হলো। তাঁর ধারনা ছিল, পাণ্ডবেরা বারণাবতে সেই গালার বাড়িতে পুড়ে মরেছেন। কিন্তু এখন এ কী শুনছেন?

দুর্যোধনেরা পরামর্শ করতে লাগলেন, পাণ্ডবদের আর বাড়তে না দিয়ে কী করে মেরে ফেলা যায়, তাই করা চাই। ঠিক হলো, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। কর্ণ বললেন, "আমিই ওদের শেষ করবো।"

ধৃতরাষ্ট্র সেকথা শুনে বললেন, "আমার তাতে মত আছে। কর্ণ বীরের মতো কথাই বলেছে বটে।"

কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর দুর্যোধনদের বললেন, "বাপুহে! যুদ্ধের নাম মুখেও এনো না। সেই স্বয়ংবর সভায় ভীম-অর্জুনের হাতে কী রকম দুর্দশায় পড়েছিলে মনে নেই? কাজেই যুদ্ধ না করে বেশ ভাল রকম ভেট পাঠিয়ে পাণ্ডবদের খুশী কর। তারপর সকলকে এখানে এনে রাজ্যটি দুভাগ করে পাওনা অংশটি তাদের দাও। তোমরা বারণাবতে যা করেছো তা সকলেই জানতে পেরেছে।"

সৎপরামর্শ কারো ভাল লাগে না। দুর্যোধনদেরও ভাল লাগলো না। ধৃতরাষ্ট্রও শুনে খুশী হলেন না। আবার, পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও সাহসে কুলোয় না। অগত্যা ভীষ্মদেবের কথায় রাজী হয়ে সেই অনুসারে কাজ করলেন।

পঞ্চপাণ্ডব, কুন্তী ও দ্রৌপদীকে হস্তিনায় আনা হলো! ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের খুব আদর-আপ্যায়ন করলেন। তারপর যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "বৎস! তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে যাও। সেখানে তোমার রাজধানী করে আনন্দে রাজ্যশাসন করো। দুর্যোধনের কাছে না থাকলে কোন গোলমাল হবে না।"

তাই হলো। রাজা যুধিষ্ঠিরের শাসনে প্রজারা হলো সুখী। সকলের মুখেই পাণ্ডবদের জয়ধ্বনি।

পাণ্ডবদের দিন সুখে যায়। কিন্তু একদিন অর্জুন এক বামুনকে সাহায্য করতে গিয়ে একটি নিয়ম ভাঙলেন। তাতে অর্জুনের দোষ তেমন ছিল না। নিয়মটা তাঁরা পাঁচ ভাই মিলেই করেছিলেন! যিনি নিয়ম ভাঙবেন তাঁকে বারো বৎসর বনবাসে থাকতে হবে, এই সাংঘাতিক শাস্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। নিয়মটা ভেঙে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে বললেন, "দাদা, অনুমতি দাও, বনে যাই।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "ভাই, তোমার অন্যায় তো কিছু হয়নি। দ্রৌপদী আর আমি যখন

ঘরে বসে গল্প করছিলাম তখন যদি তুমি ঘরে এসে অস্ত্র না নিয়ে যেতে তাহলে গরীব বামুনের গরুগুলো চোরে নিয়েই যেতো। তুমি সেই জন্যেই এসেছিলে। এতে তোমার দোষ কী ?

অর্জুন বললেন, "যে কারণেই হোক নিয়মটি যখন ভেঙেছি তখন আমায় শাস্তি নিতেই হবে।"

তখন যুধিষ্ঠির আর কী করেন ? চোখের জলে ভাইকে বিদায় দিলেন। অর্জুন গুরুজনদের পায়ের ধুলো ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে চলে গেলেন বনে।

বনবাসে গিয়ে অর্জুন কত দেশে ঘুরে বেড়ালেন। তিনি একবার গেলেন পূর্বদিকে মণিপুরে। সেখানকার রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকেও বিয়ে করলেন। তাঁদের একটি সুন্দর ছেলে হলো। ছেলেটির নাম হলো বভ্রুবাহন। বভ্রুবাহন পরে হয়েছিলেন খুব বড় বীর।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে গেলেন দ্বারকায়। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বোন সুভদ্রাকে দেখে তাঁর খুব ভাল লাগলো। মেয়েটির যেমন রূপ, তেমনি গুণ। সুভদ্রারও অর্জুনকে পছন্দ হলো। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিয়ে হয়। বলরাম রাজী হলেন না। কিন্তু একা বলরাম আর কী করবেন ? শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন পরামর্শ হলো।

একদিন সুভদ্রা গেলেন রৈবতক পাহাড়ে শিবপূজা করতে। আর অর্জুন সেই সুযোগে তাঁকে রথে তুলে নিয়ে দিলেন রথ ছুটিয়ে। তোমরা হয়তো ভাবছো; অর্জুন খুব অন্যায় কাজ করলেন। কিন্তু সেকালে এইভাবে মেয়েকে হরণ করে বিয়ে করা ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছে খুব সম্মানের কাজ ছিল।

এই খবর শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের কাছে পৌঁছতেই মহা গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। বলরাম ও যদুবংশের বড় বড় বীর ছুটলেন অর্জুনের সঙ্গে লড়াই করতে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের অনেক বুঝিয়ে শান্ত করলেন। দ্বারকাতেই অর্জুন-সুভদ্রার বিয়ে হয়ে গেল। বনবাসের শেষ বছর দ্বারকাতেই বাস করে অর্জুন সুভদ্রাকে নিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে ফিরে এলেন। অর্জুনকে ফিরে পেয়ে সকলেরই আনন্দ হলো।

তারপর একদিন খাণ্ডব বন পোড়ানো হলো। খাণ্ডব বনে বাস করতো তক্ষক, নানা, রকমের পশুপাখি ও রাক্ষস-দৈত্য প্রভৃতি। সব সেই আগুনে পুড়ে মরলো। দেবরাজ ইন্দ্র তক্ষককে সাহায্য করতে এসে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁর সঙ্গে এমন যুদ্ধ করলেন যে, তিনি হেরে গেলেন।

হেরে গেলেও ইন্দ্র তাঁদের দুজনকে বর দিতে ইচ্ছা করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "আমায় এই বর দিন, অর্জুনের সঙ্গে যেন আমার কখন বিবাদ না হয়।"

ইন্দ্র বললেন' "তথাস্তু।"

অর্জুন বললেন, "আমায় আপনার দিব্যাস্ত্র বর দিন!"

ইন্দ্র বললেন, "মহাদেবের তপস্যা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তুমি তা পাবে।" —এই বলে ইন্দ্র চলে গেলেন।

আগেই বলেছি, খাণ্ডবে যারা বাস করতো তারা সকলেই পুড়ে মরলো। ইন্দ্রের কৃপায় মরলো না কেবল তক্ষকের ছেলে অশ্বসেন। আর, অর্জুনের দয়ায় বেঁচে রইলো ময় নামে এক দানব। দানবটি ছিল পাকা কারিগর।

সে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনি আমার প্রাণ দিলেন। এখন আপনার কী কাজ করে দিলে আপনি খুশী হবেন?

অর্জুন বললেন, "শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা কর। তুমি যদি তাঁর কোন কাজ করে দাও আমি আরও খুশী হবে।"

শ্রীকৃষ্ণ ময়কে বললেন, "তুমি যুধিষ্ঠিরের জন্যে এক আশ্চর্য সভা তৈরি করে দাও। সে সভা দেখে দেবতারাও যেন অবাক হন।"

ময় শ্রীকৃষ্ণের ফরমাশে যুধিষ্ঠিরের জন্য মণি-মুক্তা-হিরে-সোনা-রুপো প্রভৃতি দিয়ে এমন এক সভা তৈরী করে দিলে যে, সকল সভা তার কাছে হার মেনে যায়। কী তার শোভা! স্বর্গের ও মর্তের যারা দেখলো তারাও অবাক হলো। আর, বিন্দু-সরোবর থেকে ভীমকে এনে দিলে সোনার গদা এবং অর্জুনকে এনে দিলে দেবদত্ত নামে শঙ্খ। যুধিষ্ঠিরের রাজসভার শোভার কথা দিকে দিকে রটে গেল।

একদিন স্বর্গ থেকে এলেন দেবর্ষি নারদ। তিনি সভা দেখে খুব প্রশংসা করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "বৎস! তুমি রাজসূয় যজ্ঞ করো।"

কিন্তু রাজসুয় যজ্ঞ করা যে-সে রাজার কর্ম নয়। পৃথিবীর সব রাজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে যজ্ঞ করতে হয়। কোন রাজা কর দিতে না চাইলে বা বিরোধিতা করলে তাঁকে যুদ্ধে হারিয়ে তাঁর কাছ থেকে কর আদায় করতে হয়। কাজেই কাজটা যে কত কঠিন তা বুঝতেই পারছো। তবু যুধিষ্ঠির পিছপা হলেন না।

তিনি দ্বারকা থেকে শ্রীকৃষ্ণকে আনলেন। শ্রীকৃষ্ণ এসে যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা শুনে বললেন, "বেশ তো! রাজসূয় যজ্ঞ, আপনার মতো রাজারই করা উচিত। তবে মগধের রাজা জরাসন্ধকে আগে বশ করা দরকার। রাজা জরাসন্ধ শিশুপালকে সেনাপতি করে ক্ষত্রিয় রাজাদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করছেন। তিনি একটা যজ্ঞ করে সেই যজ্ঞে একশ' রাজাকে বলি দেবেন বলে এ পর্যন্ত ছিয়াশী জন ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী করেছেন। বাকি মাত্র আর চৌদ্দ জন। কাজেই জরাসন্ধকে জয় করতে পারলে আপনি সকলকেই বশ করতে পারবেন।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "কিন্তু জরাসন্ধ যে মহা শক্তিমান রাজা!"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ভয় নেই। ভীম, অর্জুন আর আমি গিয়ে দফা রফা করবো।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "তাই হোক।"

শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অর্জুনকে নিয়ে চললেন, জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে। গিরিব্রজের চারধার পাঁচটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা। সেখানে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন চললেন বামুনের বেশে। তাঁরা একটি পাহাড়ের চুড়া ভেঙে জরাসন্ধ যেখানে যজ্ঞে বসেছিলেন সেখানে গিয়ে হাজির।

জরাসন্ধ মনে করলেন, তাঁরা বামুন। তাই তাঁদের খুব আদর-যত্ন করতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "মহারাজ! আমরা বামুন নই। আমি দ্বারকার কৃষ্ণ। আর এঁরা হস্তিনার রাজপুত্র ভীম আর অর্জুন। কাজেই বুঝতে পারছেন, আমরা ক্ষত্রিয়। আপনি যে সব নিরীহ ক্ষত্রিয় রাজাদের বন্দী করে রেখেছেন তাঁদের এখনই ছেড়ে দিন। না ছাড়েন তো আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন।"

জরাসন্ধ অমনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা, এখনই তোমাদের যুদ্ধের সাধ মেটাচ্ছি। আগে ভীম আসুক। দেখি সে কত বড় বীর!"

ভীম তো যুদ্ধই চান। বেধে গেল জরাসন্ধ ও ভীমে তুমুল যুদ্ধ! দুজনেই বীর। কেউ কারুকে হারাতে পারেন না। তেরো দিন ধরে তারা যুদ্ধ করলেন। তবু কোন পক্ষের হার-জিৎ হলো না'

এখন, জরাসন্ধের জন্মকথা বড় অদ্ভুত। কেবল শ্রীকৃষ্ণ তা জানতেন। জরাসন্ধের দুই মা ছিলেন। জরাসন্ধ তাঁদের এক এক জনের শরীরে আধখানা করে জন্মেছিলেন! জরা নামে এক রাক্ষসী সেই দু আধখানা একসঙ্গে জোড়া দেয়। তা থেকে ছেলেটির নাম হয়, জরাসন্ধ।

তেরো দিনের দিন শ্রীকৃষ্ণ একটা সঙ্কেত করতেই জরাসন্ধের দুখানা পা ধরে টান দিয়ে তাঁর শরীর চিরে ফেললেন। জরাসন্ধ মারা গেলেন। তাঁর বন্দী রাজারা মুক্তি পেলেন।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের ছেলেকে মগধের সিংহাসনে বসিয়ে ভীম ও অর্জুনের সঙ্গে ফিরে চললেন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে। সেখানে তখন তার যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছিল!

যুধিষ্ঠির ছাড়া চার ভাই সৈন্যসামন্ত নিয়ে দূরে ও কাছে যে সব রাজা ছিলেন তাঁদের জয় করে কর আনতে বেরোলেন। একে একে সকলকেই জয় ও তাঁদের কাছ থেকে কর আদায় করে তাঁরা রাজধানীতে ফিরে এলেন।

যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পেয়ে এলেন কত রাজা-রাজড়া, কত পণ্ডিত-মুনি-ঋষি-বামুন। হস্তিনা থেকে এলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রভৃতি। এলেন ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা, শকুনি ও আরও অনেকে। তাঁদের একজনের ওপর দেওয়া হলো যজ্ঞের এক এক কাজের ভার।

শুরু হলো যজ্ঞ। এক সময়ে ভীষ্ম বললেন, "যাঁরা যজ্ঞে এসেছেন তাঁদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁকে একটি বিশেষ অর্ঘ্য এনে দাও।"

কিন্তু তিনি যে কে তা ঠিক করতে প্রথমে বেশ আলোচনা হলো। শেষে ভীষ্ম বললেন, "এখানে শ্রীকৃষ্ণের সমান কেউ নেই।" কাজেই শ্রীকৃষ্ণকেই একটি বিশেষ অর্ঘ্য এনে দেওয়া হলো।

তাই দেখে চেদীর রাজা শিশুপালের হলো ভীষণ রাগ। তিনি শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও যুধিষ্ঠিরকে গালাগাল দিতে লাগলেন। যজ্ঞ পণ্ডেরও চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক রাজা শিশুপালের পক্ষ নিয়ে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে গালাগাল দেওয়ায় সহদেবের খুব রাগ হলো। তিনি শিশুপালকে বললেন, "যে শয়তান শ্রীকৃষ্ণের অপমান করে তার মাথায় আমি পদাঘাত করি।"

আর যায় কোথায়? শিশুপাল তাঁর দলবল নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর দলের সকলে বলতে লাগলো, "কী! এত অপমান।"

শ্রীকৃষ্ণ এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি। তিনি চাইছিলেন যজ্ঞ যাতে পণ্ড না হয়। কিন্তু আর সইতে পারলেন না; "আমি ওর শত অপরাধ ক্ষমা করেছি। ওর মায়ের কাছে এই রকমই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। কিন্তু ওর অপরাধ আজ একশ'টারও বেশি হলো! আজ আর ওর রক্ষা নেই।"

তবু শিশুপাল শান্ত হলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ ভীষণ রূপ ধরে সুদর্শন নিয়ে তাঁর মাথা

কেটে ফেললেন। শিশুপালের দলের সকলে তাই দেখে ভয়ে একেবারে জড়সড়। তারপরে বেশ শান্তিতে যজ্ঞ শেষ হলো।

যজ্ঞ তো শেষ হলো, কিন্তু তারপর থেকে পাণ্ডবদের কপালে আবার শুরু হলো গভীর দুঃখ। কী দুঃখ তা বলি শোন।

যজ্ঞ শেষ হলে যে যার মতো দেশে ফিরে গেলেন। গেলেন না কেবল দুর্যোধন আর তাঁদের মামা শকুনি। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাজসভা বেশ ভাল করে দেখে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু তাতে হলো এক কাণ্ড। সভাঘরের দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল স্ফটিকপাথর দিয়ে। দুর্যোধন মনে করলেন, বুঝি সেটা ফাঁকা দরজা। তাই যেমনি সেখান দিয়ে বার হতে গেলেন অমনি সেই দেয়ালে মাথা গেল ঠুকে। মেঝেও তৈরি করা হয়েছিল স্ফটিকপাথরে। জায়গাটা জলের মতো দেখাচ্ছিল। দুর্যোধন তাই পোশাক গুটিয়ে জায়গাটা পার হতে গিয়ে খেলেন এক আছাড়। আর এক জায়গায় জলকে স্ফটিক পাথর মনে করে যেতে গিয়ে গেলেন জলে পড়ে। এই সব ব্যাপারে দুর্যোধনের খুব রাগ হলো। তার ওপর পাণ্ডবদের এত ধনদৌলত! দেখে তাঁর মন হিংসায় জ্বলে-পুড়ে যেতে লাগলো।

হস্তিনায় ফিরে এসে মামা-ভাগ্নে পরামর্শ করতে লাগলেন, কেমন করে পাণ্ডবদের সর্বনাশ করা যায়।

শকুনি পরামর্শ দিলেন, "তোমার বাবাকে বলে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলতে হস্তিনায় ডাক। মিথ্যা পাশাখেলায় তাঁকে হারিয়ে রাজ্যপাট দখল করা যাবে।"

শকুনির পরামর্শ দুর্যোধনের মনঃপুত হলো। তিনি গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সে কথা বলতে তিনি তাতে প্রথমে মত দিলেন না, বললেন, "কাজটা খুবই অন্যায় হবে।"

বিদুরও বার বার বললেন, "মহারাজ। এমন অন্যায় কাজ কখনই ঘটতে দেবেন না।"

কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছেলেদের এত ভাল বাসতেন যে, তাঁদের অন্যায় কাজগুলোও সহ্য করতেন। তাই দুর্যোধন যা চাইছিলেন শেষটায় তা হলো! বিদুর গেলেন ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় নিমন্ত্রণ করতে। সেকালে রাজারা পাশা খেলতেন। কোন রাজা পাশা খেলার নিমন্ত্রণ করলে তা গ্রহণ না করলে তাঁর অসম্মান করা হোত। যুধিষ্ঠিরও পাশা খেলা জানতেন। তবে ভাল খেলতে পারতেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে চার ভাই, মা কুন্তী দেবী, দ্রৌপদী ও আরও অনেককে নিয়ে চললেন হস্তিনায়।

কৌরবদের পক্ষে পাশা খেলতে লাগলেন শকুনি। তাঁর এক জোড়া পাশা ছিল। তাই

দিয়ে তিনি খেলতেন। ঐ পাশাজোড়ার মধ্যে ছিল এক চালাকি। তাই তাঁকে কেউ হারাতে পারতো না। তিনি সকলকে হারিয়ে দিতেন।

পাশা খেলতে বসে যুধিষ্ঠির বুঝলেন, দুর্যোধনের মনে কু-অভিসন্ধি আছে। কিন্তু তখন আর কী করবেন ?

পণ রেখে খেলা হতে লাগলো। শকুনির চালে যুধিষ্ঠির একে একে সব হারালেন। তাঁর রাজ্যপাট গেল, নিজে ও চার ভাই গেলেন। বাকি রইলেন দ্রৌপদী। তাঁকেও পণ রেখে খেলতে লাগলেন।
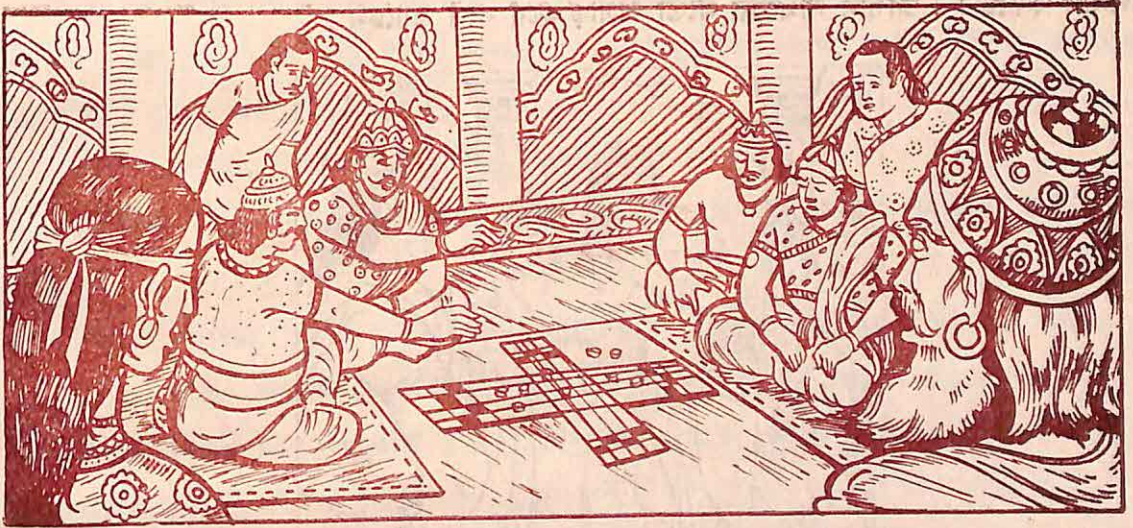
যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কৌরবদের নিষ্ঠুর পাশাখেলা

খেলার আসরে বসেছিলেন অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র। তিনি চোখে কিছু না দেখলেও কানে সব শুনছিলেন, কৌরবদের জয়ে ও পাণ্ডবদের সর্বনাশে তাঁর মনে খুব আনন্দ হচ্ছিল। তিনি হাসতে হাসতে অন্তঃপুরে চলে গেলেন। কিন্তু দুঃখে ও লজ্জায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি মাথা নিচু করে রইলেন।

যুধিষ্ঠির শেষে দ্রৌপদীকে হারালেন। অমনি দুর্যোধনের আজ্ঞায় দুঃশাসন অন্তঃপুর থেকে দ্রৌপদীকে "দাসী" "দাসী" বলে টানতে টানতে সেই সভায় সকলের সামনে এনে আপমান করতে লাগলেন। সে যে কী অপমান তা বলতে মুখে বাধে! দ্রৌপদীর কাতর আবেদন শুনে তাঁর বীর স্বামীরা অসহায়ের মতো চুপ করে বসে রইলেন! ভীষ্ম, দ্রোণ

প্রভৃতিও তাঁকে সেই অপমান থেকে রক্ষা করতে পারলেন না। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে দ্রৌপদী চরম অপমান থেকে রক্ষা পেলেন। কিন্তু দুর্যোধন আবার তাঁকে কুৎসিত ভাবে অপমান করলেন, কর্ণ তাঁকে বিশ্রী গালাগালি দিলেন। ভীম আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, "আজ আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি, ঐ দুরাত্মা দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান করবো। আর ঐ নরাধাম দুর্যোধনের উরু গদাঘাতে ভাঙবো, যদি না পারি আমি যেন কখন স্বর্গে যেতে না পারি।"

ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনে সভার সকলে ভাবতে লাগলেন, না জানি কী অমঙ্গল হয়।

গান্ধারী গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "মহারাজ! আমাদের দুর্মতি ছেলেরা সতী নারীর অপমান করছে। আপনি পাথরের মতো অসাড় হয়ে বসে আছেন?"
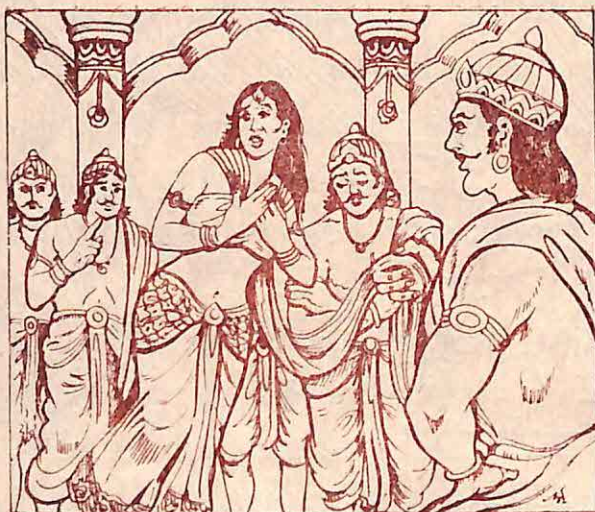
সভায় সকলের সামনে কৌরবরা দ্রৌপদীকে অপমান করতে লাগলেন

গান্ধারীর এমন কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র নীরব। ঠিক সেই সময়ে রাজবাড়িতে ভীষণ অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা গেল। ধৃতরাষ্ট্র তখন আয় স্থির থাকতে পারলেন না, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীকে ডাকিয়ে আনালেন। অনেক মিষ্ট কথা বলে তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন। আর বললেন, "তোমাদের সমস্ত পণ থেকে মুক্তি দিলাম। তোমরা ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে গিয়ে আবার আগের মতো রাজত্ব করো।"

ধৃতরাষ্ট্রের কথায় যুধিষ্ঠির সন্তুষ্ট হলেন। তিনি সকলকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে চললেন।

কিন্তু দুর্যোধন শান্ত হলেন না। পাণ্ডবদের সর্বনাশ তিনি করবেনই। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে নানা কথা বলে তাঁর মন ফিরিয়ে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আবার পাশাখেলায় মত দিলেন।

পাণ্ডবেরা তখনও ইন্দ্রপ্রস্থে পৌঁছননি, ধৃতরাষ্ট্রের ডাকে পথ থেকে আবার ফিরে এলেন। আবার পাশাখেলা শুরু হলো। এবার পণ হলো হারলে বারো বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাসের সময় যদি ধরা পড়েন, আবার বারো বছর বনবাসে ও এক বছর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে।

এই পণ রেখে খেলা হতে লাগলো। কিন্তু শকুনির সঙ্গে সরলমতি যুধিষ্ঠির পারবেন কেন? খেলাতে তাঁর হার হতে লাগলো। আর দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি তাঁদের সকলকে অপমানের চূড়ান্ত করতে লাগলেন।

ভীম গর্জন করে সেই আগের প্রতিজ্ঞা আবার করলেন।

মহাবীর অর্জুন বললেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ঐ নীচ কর্ণকে নিজের হাতে বধ করবোই।"

সহদেব বললেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করছি, শকুনিকে বধ করে পৃথিবীর কলঙ্ক দূর করবো।"

নকুল বললেন, "আমি বধ করবো তাদেরই যারা দুরাচারদের সাহায্য করতে আসবে।"

তাঁদের প্রতিজ্ঞা শুনে ধৃতরাষ্ট্র ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। কিন্তু তখন কুরুকুলের রক্ষার আর উপায় নেই।

পাণ্ডবেরা মা কুন্তী দেধীকে কাকা বিদুরে বাড়ি রেখে দ্রৌপদীকে নিয়ে বনে চললেন। হস্তিনায় সকলের চোখে জল এলো। এদিকে দুষ্টু দুঃশাসন আবার দৌপদীর বেণী ধরে একটানে তা খুলে দিলেন। তখন দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করলেন, "যেদিন এই দুরাচারদের পাপের যোগ্য শাস্তি হবে সেদিনই এই বেণী বাঁধবো। তার আগে নয়।"

তাঁরা চলে গেলেন বনে। এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ এসে ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "মহারাজ! কৌরবদের পাপ ষোলকলায় পূর্ণ হলো। তেরো বছর পরে কৌরবদের সকলকেই ভীম আর অর্জুনের হাতে মরতে হবে।"

শুনে ধৃতরাষ্ট্রের বুক ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

এদিকে যুধিষ্ঠির সকলকে নিয়ে এলেন বনে। তাঁর সঙ্গে এলেন হস্তিনার অনেক বামুন-পণ্ডিত। তাঁরা বললেন, "এ পাপ রাজ্যে আমরা থাকবো না।"

সূর্যের দয়ায় যুধিষ্ঠিরের অন্নের অভাব নেই। সূর্যের পূজা করলে সূর্য খুশী হয়ে তাঁকে একখানা থালা দান করে বলেছেন, "মহারাজ! এই থালার গুনে তোমার অন্নের কোন অভাব থাকবে না।"

যুধিষ্ঠির সকলকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কাম্যক বনে। এই বনে সেই বক-রাক্ষসের ভাই কির্মীর বাস করতো। সে পাণ্ডবদের দেখে রাগে জ্বলতে লাগলো। তাঁদের সে মেরে ফেলতে ছুটলো। কিন্তু ঐ পর্যন্তই! ভীম তাকেও পাঠালেন যমের বাড়ি।

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র একদিন বিদুরকেও হস্তিনা থেকে তাড়িয়ে দিলেন। বললেন, "তুমি কেবল পাণ্ডবদের পক্ষেই কথা বল, আমার ছেলেরা তোমার চক্ষের বিষ। তুমি হস্তিনা থেকে চলে যাও।"

বিদুর কিছু না বলে কাম্যক বনে পাণ্ডবদের কাছেই চলে এলেন। তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের মহা ভাবনা হলো। কী জানি বিদুরের বুদ্ধি আর পাণ্ডবদের বাহুবল মিলে যদি সর্বনাশ করে! তাই আবার বিদুরকে হস্তিনায় ফিরিয়ে নিয়ে তাঁকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করলেন!

পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে কিছুদিন বসে করে দ্বৈত বনে এসে রইলেন। এই বনের শোভা বড় চমৎকার। কিন্তু সকলেরই মনে দুঃখ।

একদিন মহর্ষি ব্যাসদেব এসে যুধিষ্ঠিরকে দেবতাদের কাছ থেকে অস্ত্রলাভের বিদ্যা শিখিয়ে দিলেন। অর্জুন সে বিদ্যা শিখে নিয়ে চললেন হিমালয়ে তপস্যা করতে! তিনি এলেন হিমালয় পাহাড়ে। হিমালয় পার হয়ে এলেন ইন্দ্রকীল পাহাড়ে। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। দেবরাজ বললেন, "বৎস। তুমি তপস্যায় মহাদেবকে খুশী করলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।"

অর্জুন তাই করলেন। চারমাস কঠোর তপস্যার পর মহাদেব কিরাতবেশে অর্জুনকে দেখা দিলেন। একটা পশুকে শিকার করা নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বাধলো। ফলে সেই কিরাতের সঙ্গে অর্জুনের ঘোর যুদ্ধ হলো। অর্জুন তাতে হেরে গেলেন বটে, কিন্তু মহাদেব তাঁর ওপর খুব খুশী হয়ে নিজের আসল পরিচয় দিলেন। আর দিলেন, পাশুপত নামে এক মহা অস্ত্র। সে অস্ত্রে এক নিমেষে সব ভস্ম করা যায়। পাশুপত অস্ত্র লাভ করে অর্জুন স্বর্গে গিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকেও কত রকমের অস্ত্র পেলেন।

এদিকে দ্বৈত বনে কিছুকাল থেফে পাণ্ডবেরা আবার এলেন সেই কাম্যক বনে। সেখানে

থাকতেন বৃহদশ্ব নামে এক মুনি। তিনি যুধিষ্ঠিরকে কয়েকদিনে খুব ভাল পাশা খেলা শিখিয়ে দিলেন। যাবার সময়ে বলে গেলেন, "তোমাদের দুঃখের দিন শীঘ্রই শেষ হবে।"

মহাদেব খুশি হয়ে অর্জুনকে পাশুপত নামে মহা অস্ত্র দিলেন

কিছুকাল পরে স্বর্গ থেকে এলেন লোমশ মুনি। তিনি যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের খবর দিলেন। বললেন, "অর্জন চিত্রসেন নামে গন্ধর্বের কাছে নানা রকমের আশ্চর্য গান-বাজনা শিখেছে। তোমরা শান্ত হও। সে শীঘ্রই ফিরবে। তবে তার ইচ্ছা তোমরা কিছুদিন তীর্থে তীর্থে বেড়াও।"

লোমশ মুনির কথা শুনে পাণ্ডবেরা তাঁর পুরুত ধৌম্যের সঙ্গে তীর্থে বেড়াতে বার হলেন। কয়েকমাসে কয়েকটি তীর্থে ঘুরে শেষে এলেন কৈলাস পর্বতের কাছে। সেখানে পড়লেন মহা মুশকিলে। শুরু হলো তুষার ঝড়। একটু যেতে না যেতেই কারো আর নড়বার শক্তি রইলো না। দ্রৌপদী অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তখন ভীমের মনে পড়লো তাঁর ছেলে ঘটোৎকচকে। তাঁকে ডাকতেই তিনি একদল রাক্ষস নিয়ে এসে সকলকে কাঁধে করে

বদরিকাশ্রমে তুলে দিলেন। অর্জুন এখান থেকেই স্বর্গে গিয়েছিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁর জন্যে সেখানে কিছুদিন অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সেখানে একদিন একটি সহস্রদল পদ্ম দেখে দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, "এমন সুন্দর ফুল আমায় আরও এনে দাও।"

ভীম তখনই চললেন সহস্রদল পদ্মের সন্ধানে। অনেক দূর এসে একটি সুন্দর পুষ্করিণী দেখে তাতে স্নান-আহ্নিক করে আবার যাবেন এমন সময়ে দেখেন পথে একটা হনূমান পড়ে আছে। প্রথমে মনে করলেন, সেটা সাধারণ একটা হনূমান। তাই তাকে আমলেই আনলেন না। কিন্তু একটু পরেই তাঁর ভুল ভাঙলো। হনূমান বললেন, "বাপুহে! আমার অসুখ। নড়তে পারছি না। তুমি আমার লেজটা সরিয়ে যাও।"

ভীম প্রথমে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে লেজটা সরাতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন বুঝলেন, এ তো সামান্য হনুমান নয়!

হনুমান পয়িচয় দিয়ে বললেন, "আমি পবন-নন্দন হনূমান! তোমার বড় ভাই।"

ভীমও পবন-নন্দন। তিনি দাদার কাছ থেকে জেনে নিলেন সহস্রদল পদ্ম কোথায় ফোটে।

হনূমান বললেন, "কৈলাস পর্বতের ওপর কুবেরের পুষ্করিণীতে।"

ভীম তৎক্ষনাৎ সেখানে চললেন। সেখানে পেঁৗছে ফুল তুলতে গেলে যারা সেই পুষ্করিণী পাহারা দিচ্ছিল তাদের সঙ্গে বাধলো বিবাদ। জন কতককে ভীম মেরে ফেললেন। এই খবর গেল কুবেরের কাছে। তিনি যখন শুনলেন, ভীম এসেছেন ফুল নিতে তখন কুবেরের সব রাগ জল হয়ে গেল। তাঁর আদেশে চৌকিদারেরা পুষ্করিণী থেকে ফুল তুলে দিলে।

এদিকে ভীমের ফিরতে দেরি দেখে যুধিষ্ঠির পড়লেন মহা ভাবনায়। ডাকলেন ঘটোৎকচকে। তিনি এসে পাণ্ডবদের সকলকে পেঁৗছে দিলেন কুবেরের সেই পুষ্করিণীর ধারে। কুবের এসে তাঁদের নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে অলকায়। সেখানে কিছুকাল তাঁদের কাটলো। সেখান থেকে তাঁরা গেলেন গন্ধমাদন পাহাড়ে। সেখানে অর্জুনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ একদিন স্বর্গ থেকে ফিরে এলেন অর্জুন। পাঁচ বছর পরে তাঁকে পেয়ে সকলের কী আনন্দ!

সেখান থেকে পাণ্ডবেরা আবার এলেন কাম্যক বনে। সেখানে কিছুদিন বাস করে আবার দ্বৈত বনে এসে বাস করতে লাগলেন।

এই বনের কাছে ছিল কৌরবদের ঘোষ-পল্লী নামে একটি জায়গা। সেখানে ধৃতরাষ্ট্রের এক লক্ষ গরু ছিল। একদিন কর্ণ ও শকুনি দুর্যোধনকে বললেন, "চল, আমরা ভিখারী পাণ্ডবদের আমাদের ধনদৌলতের জৌলুস দেখাইগে! তা দেখে পাণ্ডবদের খুব দুঃখ হবে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আপত্তি করলে বলবো,—আমরা ঘোষ-পল্লী দেখতে যাচ্ছি।"

দুর্যোধন তো এই চান। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। তারপর কৌরবেরা খুব জাঁকজমক করে বাড়ির মেয়েদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে বার হলেন রাজবাড়ি থেকে।

এখন, পাণ্ডবেরা যেখানে বাস করতেন তার কাছেই ছিল সুন্দর এক পুষ্করিণী। সেদিন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন তাঁর বাড়ির সকলকে নিয়ে সেই পুষ্করিণীতে তখন স্নান করছেন। তাঁদের পাহারা দিচ্ছে হাজার হাজার গন্ধর্ব সৈন্য। দুর্যোধন এলেন তার দলবল নিয়ে। চিত্রসেন বুঝতে পেরে ছিলেন, দুর্যোধন কেন অমন শেভোযাত্রা এনেছেন। তিনি দুর্যোধনকে দলবল নিয়ে সরে যেতে বললেন।

দুর্যোধন কী ভাল কথার মানুষ? কথায় কথায় বাধলো বিবাদ, শুরু হলো যুদ্ধ। গন্ধর্বরা কৌরবদের অনেক সেনাকে যমের বাড়ি পাঠালো। কর্ণ, শকুনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। চিত্রসেনের হাতে বন্দী হলেন দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবেরা।

এই খবর গিয়ে পৌছলো যুধিষ্ঠিরের কাছে। শুনে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না, ভীম ও অর্জুনকে বললেন, "তোমরা এখনই গিয়ে ওদের উদ্ধার করো।"

ভীম বললেন, "কী দরকার? ওরা যেমন মানুষ তেমন শাস্তিই হয়েছে।" যুধিষ্ঠির বললেন, "ভাই, তুমি এ কী কথা বলছো? আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে যতই বিবাদ থাক, আমাদের বংশের অপমান সইবো কেন? অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা এক শ' পাঁচ ভাই। তোমরা এখনই যাও।"

যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় ভীম অর্জুন তৎক্ষণাৎ চললেন গন্ধর্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। তাঁদের হাতে গন্ধর্বসেনার অশেষ দুর্গতি হতে লাগলো। চিত্রসেন শেষ অবধি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন না। তিনি অর্জুনের বন্ধু, স্বর্গে অর্জুনকে তিনি গান শিখিয়েছিলেন। দু' বন্ধুতে দেখা হতে সব বিবাদ মিটে গেল। চিত্রসেন বললেন, "ঐ শয়তানেরা গরু দেখবার ছুতো করে তোমাদের মনে দুঃখ দিতে এসেছে। তাই ওদের বন্দী করেছি।"

অর্জুন বললেন, "ঠিক কাজই করেছো। ওদের শিক্ষা হয়েছে।"

কিন্তু যুধিষ্ঠির নিজের হাতে দুর্যোধনদের বাঁধন খুলে দিয়ে বললেন, "এমন কাজ আর করো না।"

দুর্যোধন লজ্জায়, অপমানে মাথা নিচু করে বাড়ির সকলকে নিয়ে হস্তিনায় ফিরে চললেন। পথে কর্ণ ও শকুনির সঙ্গে দেখা হতে বললেন, "তোমরা যে কত বড় বীর তা বুঝলাম। আমি আর রাজা হতে চাই না। দুঃশাসন গিয়ে হস্তিনার রাজা হোক। আমার মরাই ভাল।"

দুর্যোধনকে অনেক বুঝিয়ে সকলে শান্ত করলেন। হস্তিনায় গেলে কর্ণ বললেন, "পাণ্ডবেরা চার ভাই মিলে পৃথিবী জয় করেবে, আমি একাই তা করবো।"

দুর্যোধন খুশী হয়ে কর্ণের দিগ্বিজয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন। কর্ণ চললেন দিগ্বিজয়ে। তিনিও মস্ত বীর। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিদি চারধারের সমস্ত রাজা-মহারাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে হস্তিনায় ফিরলেন। দুর্যোধন মস্ত এক যজ্ঞ করে বহু ধন-রত্ন দান করলেন। কর্ণের বীরত্বে তাঁর সাহস খুব বেড়ে গেল।

যজ্ঞের শেষে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করলেন, "যতদিন অর্জুনকে বধ করতে না পারি ততদিন পা ধোব না, জল খাবো না, কেউ কিছু চাইলে তাকে শুধু হাতে ফেরাবো না।"

শুনে দুর্যোধনের আনন্দ ধরে না। আর, যুধিষ্ঠির মনে মনে ভয় পেলেন।

যুধিষ্ঠির সেদিন দুর্যোধন প্রভৃতিকে চিত্রসেনের হাত থেকে রক্ষা করলেও দুর্যোধনের কিন্তু শিক্ষা হলো না। তিনি আবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কি করে পাণ্ডবদের সর্বনাশ করা যায়। দুর্বাসা নামে এক তেজী মুনি ছিলেন। তাঁর মনের মতো কাজ না হলে তিনি ভীষণ রেগে শাপ দিয়ে সব ভস্ম করে দিতেন। তাই সকলে তাঁকে ভয় করতো। একদিন তিনি এলেন দশ হাজার শিষ্য নিয়ে হস্তিনায় দুর্যোধনের অতিথি হতে। দুর্যোধন তাঁকে এমন আদর-যত্ন করলেন যে দুর্বাসা রাগ করবার কোন কারণ খুজে পেলেন না। যাবার সময় তিনি দুর্যোধনকে বর দিতে চাইলেন।

দুর্যোধন বললেন, "মুনিবর! দ্রৌপদীর খাওয়াদাওয়ার পর আপনার শিষ্যদের নিয়ে পাণ্ডবদের অতিথি হন, আমি এই বর চাই।"

দুর্বাসা বললেন, "তথাস্তু।" তারপর সেই দশ হাজার শিষ্য নিয়ে চললেন কাম্যক বনে পাণ্ডবদের অতিথি হতে।

দুর্যোধনেরা ভাবলেন, এবার পাণ্ডবদের সর্বনাশ। তাঁরা দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্যদের ভাল

করে খাওয়াতে পারবেন না। তাতে মুনি যাবেন রেগে আর শাপ দিয়ে সব ভষ্ম করে দেবেন। এই ভেবে কৌরবেরা সকলে মহা খুশী। আগেই বলেছি, সূর্য সন্তুষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠিরকে একখানি থালা দান করেছিলেন! থালাখানি দান করে বলেছিলেন, "দ্রৌপদীর যে পর্যন্ত না খাওয়া হয় সে পর্যন্ত এই থালা ভরা থাকবে।"। দুর্যোধনেরা একথা জানতেন। তাই দুর্বাসাকে দ্রৌপদীর খাওয়াদাওয়ার পর যেতে বললেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের সহায় তাঁদের ভাবনা কী? দুর্বাসা সদলবলে যখন কাম্যক বনে গিয়ে পৌঁছলেন তখন রাত হয়েছে। পাণ্ডবেরা খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রাম করছেন। মুনি তাঁদের কুটীরে গিয়ে অতিথি হতেই যুধিষ্ঠির তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করে বসালেন। কিন্তু ভয়ে তাঁর বুক কাঁপতে লাগলো। এখন এঁদের কী খেতে দেবেন? ঘরে যে কিছুই নেই।

দুর্বাসা বললেন, "আমাদের খাবার ব্যবস্থা কর। আমরা গঙ্গাস্নান করে আসছি।"—এই বলে দশ হাজার শিষ্য নিয়ে গঙ্গাস্নানে চললেন।

দ্রৌপদী সে কথা শুনে কাতরভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। তাঁর ডাকে শ্রীকৃষ্ণ দেখা দিয়ে বললেন, "ভয় নেই। আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে। আগে আমায় কিছু খেতে দাও।"

দ্রৌপদী বললেন, "কি খেতে দেবো? থালাতেও কিছু নেই। ঘরও শূন্য।"

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ভাল করে দেখো। সামান্য হলেও চলবে।"

দৌপদী থালাখানি আনলে, শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ঐ যে থালার এক কোণে একটু শাক-ভাতের কণা রয়েছে। ওতেই আমার তৃপ্তি হবে।"

দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে সেই কণাটুকু দিতে তিনি তাই খেয়ে বললেন, "জগৎ তৃপ্ত হোক।"

এই বলে শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলেন। আর ওদিকে দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্যেরা স্নান করে উঠেই দেখেন, তাঁদের একটুও ক্ষুধা নেই। মনে হতে লাগলো যেন অনেক খেয়েছেন। মুনি বললেন, "আজ রাতে এই গঙ্গাতীরেই পড়ে ঘুমানো যাক।"

তাই হলো। ভোর হতে তিনি শিষ্যদের নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন অন্য জায়গায়

দুর্যোধন এ কথা শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। তাঁর এমন ফন্দিটা খাটলো না! তারপর তিনি পাণ্ডবদের সর্বনাশের আর কত চেষ্টা করলেন। কিন্তু সবই বিফল হলো।

এদিকে পাণ্ডবদের বনবাসের দিন ফুরিয়ে আসতে লাগলো। আর কর্ণ অর্জুনকে বধ করবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, সে কথা মনে করে যুধিষ্ঠিরের বড় ভয় হতে লাগলো। কর্ণের

জন্ম থেকেই আছে অভেদ্য কবচ-কুণ্ডল। সেজন্যে তাঁকে কেউ বধ করতে পারবে না। কিন্তু পাণ্ডবদের কিসে ভাল হয় সে কথা দেবগণও ভাবছেন। তাই একদিন স্বর্গ থেকে ইন্দ্র এসে কর্ণের কবচ-কুণ্ডল কৌশলে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে গেলেন। তার বদলে ইন্দ্র তাঁকে দিয়ে গেলেন আর এক সাংঘাতিক অস্ত্র।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "জগৎ তৃপ্ত হোক"।

কর্ণের কবচ-কুণ্ডল ইন্দ্র নিয়ে গেলে পাণ্ডবেরা হলেন যেমন সুখী, দুর্যোধনদের হলো তেমনি ভয়।

কাম্যক বনে থেকে পাণ্ডবেরা আবার এলেন দ্বৈত বনে। সেখানে একদিন হরিণ তাড়াতে গিয়ে পাঁচ ভাই পিপাসায় বড় কাতর হয়ে পড়লেন। কাছেই ছিল একটি জলাশয়। তার তীরে ছিল এক যক্ষ। প্রথমে নকুল জলাশয়টির ঘাটে জল নেবার জন্যে নামতেই যক্ষ তাঁকে নিষেধ করলো। নকুল তা শুনলেন না। অমনি তিনি মারা গেলেন। তাঁকে খুঁজতে এসে জলে নামতে গিয়ে মারা গেলেন সহদেব। এইভাবে পরপর মারা গেলেন অর্জুন ও ভীম। খুঁজতে এসে তাঁদের দশা দেখে যুধিষ্ঠির হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন।

এক বক তখন যুধিষ্ঠিরকে বললে, "আমিই তোমার চারভাইকে মেরে ফেলেছি। আমার কথার উত্তর না দিয়ে জল খেলে তোমারও প্রাণ যাবে।"

বক যুধিষ্টিরকে খুব কঠিন কতকগুলি প্রশ্ন করলো। সে সব প্রশ্নের উত্তর যুধিষ্ঠির ছাড়া আর কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। যুধিষ্ঠিরের উত্তর শুনে বক খুশী হয়ে চার
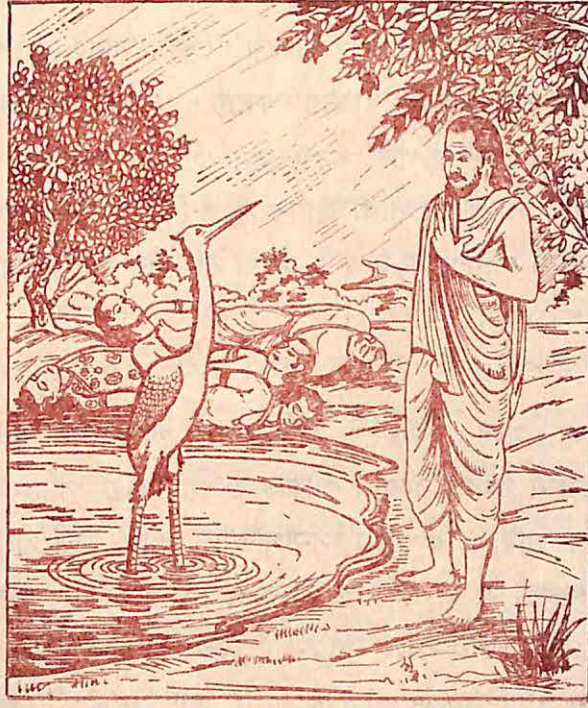
বক যুধিষ্ঠিরকে খুব কঠিন কতকগুলি প্রশ্ন করলেন।

ভাইকে বাঁচিয়ে দিলে! আর বললে, "আমি ধর্ম। তোমাদের বনবাসের দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোমরা বিরাটনগরে গিয়ে অজ্ঞাতবাসে থাকো! কেউ তোদের ধরতে পারবে না।"

এই বলে ধর্ম চলে গেলেন। পাণ্ডবেরাও চলে এলেন নিজেদের থাকবার জায়গায়।

তারপর একদিন পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই সঙ্গের সকলকে বিদায় দিয়ে ছদ্মবেশ পরলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের নাম রাখা হলো 'কঙ্ক', ভীমের 'বল্লব', অর্জুনের 'বৃহন্নলা', নকুলের 'গ্রন্থিক', সহদেবের 'তন্ত্রিপাল' আর দ্রৌপদীর 'সৈরিন্ধ্রী'। ঠিক হলো বিরাটনগরে গিয়ে যুধিষ্ঠির চেষ্টা করবেন রাজার সভাসদ হয়ে পাশাখেলা শিক্ষকের কাজ নিতে। ভীম পাচকের, অর্জুন নাচ-গান শেখাবার, নকুল সহিসের আর সহদেব গরু দেখাশোনার। ঐ নামগুলো ছাড়াও তাঁরা নিজেদের মধ্যে ব্যবহারে জন্য নিলেন আরও পাঁচটি নাম। নামগুলো পর পর এই—জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল।

পাণ্ডবেরা চললেন বিরাটনগরে। অনেক দেশ ঘুরে একদিন এসে পৌঁছলেন সেখানে। নগরের কাছে এক শ্মশানের ধারে একটি শমীগাছের (বাবলার মতো কাঁটাওলা এক রকমের গাছ) উঁচু ডালে নকুল তাঁদের পাঁচ ভাইয়ের অস্ত্র-শস্ত্র লুকিয়ে রাখলেন। আর, শ্মশান থেকে একটি 'মড়া' নিয়ে গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন যাতে লোকে ভূতের ভয়ে সেখানে না যেতে পারে! তারপর তাঁরা গেলেন রাজার কাছে। রাজা বিরাট পাঁচ ভাইয়ের কথা শুনে খুশী হয়ে তাঁরা যে কাজের চেষ্টা করছিলেন সেই কাজই তাঁদের দিলেন। আর, দ্রৌপদীকে দেখে এত ভাল লাগলো যে রাণী আদর করে নিজের কাছ রাখলেন। তবে দ্রৌপদী রাণীকে বললেন, "মা, আমি কারও পায়ে হাত দেবো না আর কারও এঁটো খাবো না। এই দুটি কাজ আমার দ্বারা হবে না।"

রাণী তাতেই রাজী হলেন।

তারপর দিন যায়, যায় মাস। বছরও বুঝি যায়। পাণ্ডবদের ব্যবহারে ও কাজে রাজা-প্রজা সকলেই খুশী। এমন সময়ে রাজার শ্যালক ও সেনাপতি কীচক দ্রৌপদীকে অপমান করলো। একে সে রাণীর ভাই, তার ওপর সেনাপতি। আর, তার গায়ে হাতীর মতো বল। তাই সে কাউকে গ্রাহ্য করতো না। রাজাও তাকে ভয় করতেন। দ্রৌপদী তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ছুটতে ছুটতে রাজার কাছে গেলেন। কিন্তু কীচক রাজার সামনেই দ্রৌপদীকে লাথি মারলো। সেখানে যুধিষ্ঠির ও ভীম ছিলেন। তাই দেখে ভীমের চোখ জ্বলে উঠলো। পাছে তিনি রাগের বশে একটা কিছু করে বসেন, যুধিষ্ঠির তাই ইসারা ক'র তাঁকে শান্ত করলেন। কীচকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেই লোকে তাঁদের পরিচয় পেতো। তাহলে আর অজ্ঞাতবাসে থাকা হতো না, ধরা পড়ে যেতেন। ভীম তখন শান্ত হলেন ; কিন্তু দ্রৌপদীর সঙ্গে পরামর্শ করে রাতের বেলা কীচককে কৌশলে ভুলিয়ে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তার হাত-পা-মাথা পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। কীচক মরে গেল। লোকে জানতেও পারলো না কে তাকে মেরে ফেলেছে।

ব্যাপার কিন্তু সেখানেও মিটলো না। কীচকের এক শ' পাঁচ ভাই ছিল। তারাও ছিল যেমন ষণ্ডা তেমনি শয়তান। ভীম তাদেরও মেরে ফেললেন। রাণী দ্রৌপদীকে বললেন, "বাছা! তোমার জন্যেই আমার ভাইয়েরা মারা গেল। তোমাকে আর আমার বাড়িতে রাখতে চাই না।"

তখন পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের এক বছর পূর্ণ হতে আর মাত্র তেরো দিন বাকি। দ্রৌপদী

বললেন, "মা, এতদিন আশ্রয় দিলেন। আর কয়েকটা দিন রাখুন। তারপর আমি নিজেই চলে যাবো।"

রাণী তাতে রাজী হলেন।

বিরাট রাজার হাজার হাজার গরু ছিল। তাঁর ধনদৌলত ছিল বিস্তর। দুর্যোধন ও আর কয়েকটি রাজার এই সবের উপর লোভ ছিল। কিন্তু কীচক ও তার ভাইদের ভয়ে কেউ সেদিকে ঘেঁষতেন না। কীচকদের মেরে ফেলার খবর সকলের কাছে পৌঁছলে দুর্যোধন ও ত্রিগর্ত দেশের রাজা সুশর্মা বিরাট রাজ্য আক্রমণ করার পরামর্শ আঁটতে লাগলেন। তারপর সুশর্মা হঠাৎ একদিন বিরাট রাজ্য আক্রমণ করে রাজার ষাট হাজার গরু নিয়ে পালাতে লাগলেন। রাজা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেও বন্দী হলেন। যুধিষ্ঠির তখন ভীমকে আজ্ঞা দিলেন, সুশর্মার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ভীম গিয়ে সুশর্মার বহু সৈন্য-সামন্তকে মেরে ফেলে তাঁকেই বেঁধে আনলেন। সেই সময়ে দুর্যোধনও বিরাটরাজ্যের আর এক অংশ আক্রমণ করলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁর ভাইয়েরা সকলে; এমন কি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণ। কিন্তু অর্জুন একা তাঁদের সকলকে পরাস্ত করে বিরাট-রাজা ও তার হাজার গরুকে রক্ষা করলেন। অর্জুন ছদ্মবেশে থাকলেও কৌরবেরা সকলেই তাকে চিনতে পারলেন। কিন্তু তখন তাদের অজ্ঞাতবাসের দিন শেষ হয়ে গেছে। তাই দুর্যোধনরা আর কী করবেন? তারা খুব মার খেয়ে লজ্জায় হস্তিনায় ফিরে গেলেন।

এদিকে বিরাট-রাজা যখন পাণ্ডবদের পরিচয় পেলেন তখন তাঁর কী আনন্দ! অর্জুনের ছেলে অভিমন্যুর সঙ্গে তাঁর মেয়ে উত্তরার বিয়ে দিলেন। এতে সকলেই হলেন সুখী। অভিমন্যুও তাঁর বাবার মতো বীর হয়ে উঠছিলেন। তাঁর বীরত্ব, স্বভাব ও রূপের জন্যে সকলেই তাঁকে ভালবাসতো।

পাণ্ডবদের বনবাস ও অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে বড় বড় রাজা মেয়ের বিয়ে দিয়ে কুটুম্ব হয়েছিলেন। বিরাট-রাজার বাড়িতে বড় বড় রাজা এলেন পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে। আর এলেন শ্রীকৃষ্ণ। বসলো সকলের সভা।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "পাণ্ডবেরা তাঁদের কথা রেখেছেন। তাঁরা বার বছর বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাতবাস করেছেন। এখন ওঁরা ন্যায়তঃ অর্ধেক রাজত্ব পাবার অধিকারী। দুর্যোধন যদি সহজেই রাজ্য ছেড়ে দেয় ভালই। না দিলে যুদ্ধ করে রাজ্য নিতে হবে। সে যুদ্ধে

আমরা পাণ্ডবদের পক্ষে থাকবো। তবে যুদ্ধ না করে যদি কাজ হয়, তাহলে আগে তাই করতে হবে। কাজেই আগে দুর্যোধনের কাছে হস্তিনায় দূত পাঠানো হোক।"

দ্রুপদ বললেন, "অন্য রাজাদের দুর্যোধন যাতে তার দলে টানতে না পারে সেজন্যেও তাঁদের কাছে দূত পাঠানো যাক।"

সেই কথামতো একই সঙ্গে দুর্যোধনের ও অন্যান্য রাজাদের কাছে পাণ্ডবদের খবর দিয়ে দূত পাঠানো হলো।

হস্তিনা থেকে দূত ফিরে এসে বললে, "রাজা দুর্যোধন বলেছেন, সূচের আগায় যেটুকু মাটি ধরে বিনা যুদ্ধে তাও দেবো না।"

এই খবর পেয়ে পাণ্ডবেরা যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। দুর্যোধনও জানতেন, পাণ্ডবেরা অর্ধেক রাজ্য দখল করতে যুদ্ধ করবেনই। তাই তিনিও যুদ্ধের জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করতে ও রাজাদের দলে ভিড়াতে লাগলেন। অনেক রাজা পক্ষ নিলেন। ক্রমে দু'পক্ষে বহু রাজা-মহারাজা ও সৈন্য-সামন্ত জোগাড় হলো। শ্রীকৃষ্ণকে নিজের দলে টানবার জন্যে দুর্যোধন চেষ্টা করলেন। কিন্তু নিজের বুদ্ধির দোষে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পেলেন না, কিন্তু তাঁর কোটি কোটি নারায়ণী সেনা পেলেন আর তাতেই খুশী থাকলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি হতে রাজী হলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দ্রোণের ছেলে অশ্বত্থমা প্রভৃতি বড় বড় বীর যে দুর্যোধনের পক্ষে রইলেন এ কথা না বললেও চলে। মদ্রদেশের রাজা জয়দ্রথ ছিলেন দুর্যোধনের ভগ্নিপতি। তিনিও ছিলেন মস্ত বীর। শিবের কাছ থেকে তিনি বর পেয়েছিলেন, অর্জুন ছাড়া কেউ তাঁকে যুদ্ধে হারাতে ও মারতে পারবে না। তিনিও রইলেন কৌরবদের পক্ষে। পাণ্ডবদের পক্ষেও রইলেন বড় বড় বীর ও রাজা। দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ভীমের ছেলে ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি।

যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ। তবুও ধার্মিক যুধিষ্ঠির চান যাতে যুদ্ধ না হয়। তাই হস্তিনায় আবার দূত পাঠানো হলো, যাতে গোলযোগ মিটে যায়। তাঁর আশা অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র হয়তো তাঁদের উপর অবিচার করবেন না। তিনি হয়তো চাইবেন না যুদ্ধ করে দু'পক্ষেই আত্মীয়-স্বজন ও কোটি কোটি মানুষ মারা যায়। কিন্তু তাঁর আশা ও চেষ্টা বিফল হলো। দুর্যোধন কারো কথাই শুনলেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, স্বয়ং অন্ধরাজও তাঁকে কত বোঝালেন। কিন্তু তাঁর ঐ এক কথা—বিনা যুদ্ধে রাজ্য দেবেন না।

তারপর শ্রীকৃষ্ণও সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এলেন কৌরবদের সভায়। তিনি দুর্যোধনকে

বললেন, "এ যুদ্ধের ফল হবে ভীষণ। কুরুকুল যাতে রক্ষা পায় তার চেষ্টা করো। অর্ধেক রাজ্য না দাও তো পাঁচ ভাইকে পাঁচখানি গ্রাম ছেড়ে দাও। পাণ্ড্যবরা তাতেই সন্তুষ্ট হবেন।"

দুর্যোধন বললেন, "বিনা যুদ্ধে সূচের আগায় যেটুকু মাটি ধরে তাও দেবো না।"
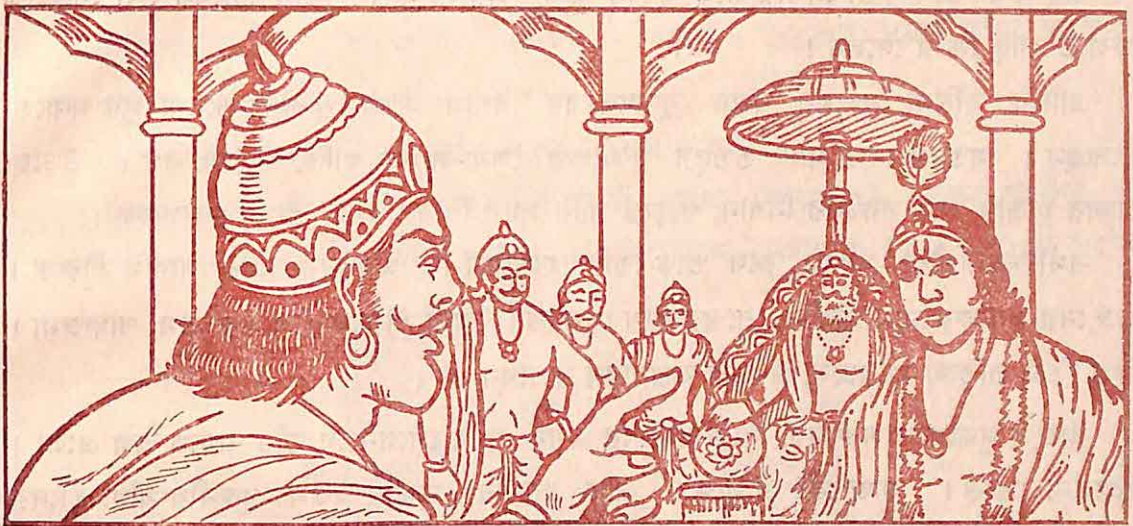
তারপর শ্রীকৃষ্ণও সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এলেন কৌরবদের সভায়।

মা গান্ধারী এসে দুর্যোধনকে কত বোঝালেন। চোখের জল ফেললেন। তাতেও দুর্যোধনের মন গললো না। তিনি পাথরের মতো কঠিন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি অপমান করতেও ছাড়লেন না। কেবল কী তাই ? কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করবার মতলব করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করে কার সাধ্য ? তিনি এমন ভীষণ মূর্তি ধরলেন যে, তাঁর কাছে আসতেই দুর্যোধনের সাহস হলো না! আসবার সময়ে তিনি অন্ধরাজকে বললেন, "মহারাজ! আমার কথায় আপনি রাজী হলেন না মরণকালে লোকে উল্টো বোঝে।"

তিনি ব্যর্থ হয়ে পাণ্ডবদের কাছে ফিরে চললেন। কর্ণকেও আড়ালে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন, পাণ্ডবেরা তাঁর সহোদর ভাই। কাজেই তাঁর পাণ্ডবদের পক্ষেই থাকা উচিত।

কর্ণ বললেন, "কুন্তী দেবী লোকের কাছে আমাকে কখনো তাঁর ছেলে বলে পরিচয় দেন নি। সকলেই জানে আমি সারথির ছেলে। দুর্যোধনকে এতদিন ভরসা দিয়ে আমি কেমন করে তাকে ছেড়ে যাবো ? লোকে যে আমাকে নিন্দা করবে।"

কুন্তী দেবীও তাঁকে নির্জনে ডেকে চোখের জলে কত বোঝালেন। কর্ণ তবুও কৌরবদের পক্ষ ছাড়তে চাইলেন না। শেষে বললেন, "অর্জুন ছাড়া আর কোন ভাইকে আমি মারব না। হয় সে আমার হাতে মরবে বা আমি তার হাতে মরবো।"

এই কথা শুনে কুন্তী দেবীর মুখে কোন কথা সরলো না। তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ি ফিরে গেলেন!

এদিকে হস্তিনা নগরের কাছে কুরুক্ষেত্রের বিশাল মাঠে কুরু-পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করতে এসেছেন। যতদূর দেখা যায় ততদূর দু'পক্ষের সৈন্য-সামন্ত, হাতি, ঘোড়া, রথ। উড়ছে হাজার হাজার নানা রকমের নিশান, পড়েছে সারি সারি শিবির, হচ্ছে ভীষণ কোলাহল।

রথী-মহারথীরা সকলে রথে চড়ে তৈরি হয়েছেন। অর্জুনের রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুনের ধনুকের নাম গাণ্ডীব, শঙ্খের নাম দেবদত্ত। আর শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম, পাঞ্চজন্য। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, এ যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না।

অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের, দিকে তাকিয়ে এমন দুঃখ পেলেন যে তাঁর চোখে জল এলো। বললেন, "কৃষ্ণ! কাজ নেই এ যুদ্ধে। এতে আমার আত্মীয়-স্বজন পূজনীয় যাঁরা তাঁদের আমায় মেরে ফেলে রাজ্য অধিকার করতে হবে। আমি চাই না এমন রাজ্য। এমন কাজ আমার দ্বারা হবে না"—এই ব'লে হাতের ধনু রথের উপর ফেলে দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তখন নানা উপদেশ দিয়ে তাঁর মনে বল সঞ্চার করতে লাগলেন। এই উপদেশ গীতা। উপদেশ শুনেই অর্জুন যুদ্ধের জন্য তৈরি হলেন।

আর ওদিকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রথ থেকে নেমে চললেন শত্রু-বুহ্যের দিকে। পাণ্ডবেরা তাই দেখে ভেবে অস্থির। ভীম, অর্জুন প্রভৃতি ছুটলেন তাঁর পিছনে। কিন্তু ধর্মরাজ কারো সঙ্গে একটি কথাও বললেন না। তিনি সোজা গেলেন, যেখানে ছিলেন ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ প্রভৃতি গুরুজন।

দুর্যোধনেরা কিন্তু বলতে লাগলেন, "যুধিষ্ঠির প্রাণের ভয়ে ভীষ্মের পায়ে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছেন।" কেউ বললেন "যুধিষ্ঠির কাপুরুষ।"

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের বললেন, "তোমাদের ভয় ও লজ্জার কোন কারণ নেই। যুধিষ্ঠির যাচ্ছেন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ নিতে। ধর্মই তাঁকে রক্ষা করবেন।"

তাঁর কথাই ঠিক হলো। যুধিষ্ঠির পূজনীয়দের প্রণাম করে ও আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে

আসতে লাগলেন। আসবার সময়ে চীৎকার করে বললেন, "কৌরবপক্ষে এমন কেউ যদি থাকেন যিনি আমার মঙ্গল চান তিনি চলে আসুন। আমরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবো।"

তার ডাক শুনে দুর্যোধনের ভাই যুযুৎসু বেরিয়ে এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "ধর্মরাজ! আমি আপনার পক্ষে যোগ দেবো।"

যুধিষ্ঠির তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "কৃষ্ণের দয়ায় তুমিই বেঁচে থেকে অন্ধরাজকে শেষ বয়সে শান্তনা দেবে!"

যুধিষ্ঠির যুযুৎসুকে নিয়ে ফিরে এলেন নিজের দলে!

বেজে উঠলো ভীষ্মের বিশাল শঙ্খ। অমনি বাজল কৌরবদের হাজার হাজার শাঁখ। এদিকে উঠলো পাণ্ডবদের ভীষণ শঙ্খধ্বনি। শুরু হলো কুরুক্ষেত্রে কৌরব-পাণ্ডবে মহাযুদ্ধ।
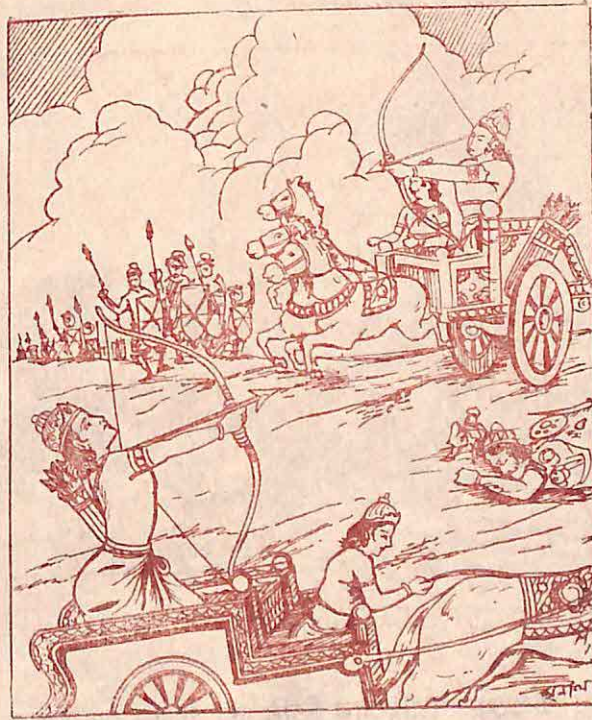
শুরু হলো কুরুক্ষেত্রে কৌরব-পাণ্ডবে মহাযুদ্ধ

এক পক্ষে অন্যায়, অপর পক্ষে ন্যায়; এক পক্ষে অধর্ম, অপর পক্ষে ধর্ম। জয় হবে তারই যে পক্ষে আছে, ন্যায় ও ধর্ম।

আঠারো দিন ধরে চললো এই মহাযুদ্ধ। দু'পক্ষেই মারা গেল কোটি কোটি সেনা, কাটা পড়লো হাতী-ঘোড়া-রথ আর মারা গেলেন ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতি ও যুযুৎসু বাদে সকল কৌরব। পাণ্ডবপক্ষেও মারা গেলেন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কতশত। রক্তে কুরুক্ষেত্রের মাটি গেল তলিয়ে। যুদ্ধে অভিমন্যু নিজের বীরত্বে সকলকে চমকে দিলেন। কিন্তু তাঁকেও মারলেন, সাতজন মহারথী ঘিরে ধরে। অথচ তিনি ছিলেন ছেলেমানুষ। কৌরবদের এমন অন্যায় কাজের কথা লোকে আজও ভুলতে পারে নি। যুধিষ্ঠির ছিলেন বরাবরই সত্যবাদী। কিন্তু গুরু দ্রোণাচার্যকে মারবার সময় তাঁকেও একবার মিথ্যার আশ্রয় নিতে হলো। দুর্যোধনকে ভীম শেষদিনে গদাযুদ্ধে মেরে ফেললেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধও শেষ হয়ে গেল।

দু'পক্ষেই মারা গেল কোটি কোটি সেনা, কাটা পড়লো হাতী ঘোড়া রথ।

পাণ্ডবগণ যিনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি তা পালন করলেন। দ্রৌপদীও তাঁর বেণী বাঁধলেন। কিন্তু পাণ্ডবদের সন্তানেরা কেউই বেঁচে রইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, সর্বনাশ! তখন তাঁর বরে অভিমন্যুর শিশুপুত্রটি বেঁচে গেল। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল পরীক্ষিৎ।

যুদ্ধের পরে ঘরে ঘরে উঠলো কান্নার রোল। চারধারে শোকের চিহ্ন। অন্ধরাজ ও মা গান্ধারী পুত্রহারা হয়ে হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন। পাণ্ডবপক্ষ বার বার যুদ্ধ নিবারণের

চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা বিফল হয়েছিল। দুর্যোধন ও তাঁর সঙ্গী-সাথী চেয়েছিলেন যুদ্ধ। তার পরিণামে এলো সারা রাজ্যে গভীর দুঃখ ও শোক!

ধৃতরাষ্ট্র তাঁর বাড়ির সকলকে নিয়ে চললেন যুদ্ধক্ষেত্রে। পাণ্ডবেরা আগেই সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁদের দেখে ধৃতরাষ্ট্রদের মনে দুঃখ আবার উথলে উঠলো। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরদের সঙ্গে ভাল করে কথা কইলেন না। তবে ভীমকে দেখতে চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ আগেই জানতে পেরেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের মনে ভীম সম্বন্ধে একটা কুমতলব আছে। সে সময়ে তাঁর মুখ দেখে সে কথা বোঝা যেতে লাগলো। তাই শ্রীকৃষ্ণ আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিলেন।

ভীমের একটি লোহার মূর্তি এনে ধৃতরাষ্ট্রের সামনে রাখা হলো। অন্ধরাজ ভীমকে আলিঙ্গন করবার ছলে মূর্তিটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে এত জোরে চাপ দিলেন যে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

অন্ধরাজ ভীমকে আলিঙ্গন করবার ছলে মূর্তিটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে জোরে চাপ দিলেন।

অন্ধরাজ লোহার ভীম ভেঙে ফেলে মনে করলেন, সত্যই ভীমকে মেরে ফেলেছেন। সেজন্যে তাঁর মনে খুব দুঃখ হলো। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "কেন আমি এমন কাজ করলাম? কেন আমার মনে সর্বনাশ করবার ইচ্ছা জাগলো?"

শ্রীকৃষ্ণ তখন অন্ধরাজকে বোঝালেন যে, রাগের বশে তিনি এমন অন্যায় কাজ করতে পারেন জেনেই ভীমের একটি লোহার মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল। সেটিই তাঁকে দেওয়া হয়েছে! তিনি সেটিকেই ভেঙে ফেলেছেন। তারপর বললেন, "মহারাজ! যুদ্ধে যে মহা সর্বনাশ হলো সেজন্যে আপনার ছেলেরাই দায়ী। পাণ্ডবদের এজন্যে দোষী করা ঠিক নয়।"

ধৃতরাষ্ট্র তখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। পাণ্ডবদের কাছে ডেকে স্নেহভরে তাঁদের আলিঙ্গন করলেন।

মা গান্ধারী, কৌরবদের বধূরা ও আর যে সব রাজারা যুদ্ধ করতে করতে মারা না গিয়েছিলেন তাঁরাও অন্ধরাজের সঙ্গে সেই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। তাঁরা হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের কান্না শুনে পাষাণও গলে যায়।

মা গান্ধারীকে ব্যাসদেব সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। সেজন্যে তিনি কিছু শান্ত হয়েছিলেন। যুদ্ধে আসবার আগে দুর্যোধন যখন তাঁকে প্রণাম ক'রে আশীর্বাদ করতে যান তিনি তখন দুর্যোধনকে বলেছিলেন, "বৎস! মনে রেখো ধর্মেরই জয় হয়।" এবং তাকে ধর্মপথে চলতে উপদেশ দেন।

জীবনে গান্ধারী নিজে কখন একটিও অন্যায় কাজ করেন নি। তবু পাণ্ডবেরা তাঁর সামনে যেতে সাহস পেলেন না। যদি তিনি রাগের বশে শাপ দেন! শেষে সাহস করে তাঁর সামনে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন। মা গান্ধারী সস্নেহে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ওপর থেকে তাঁর রাগ কিছুতেই গেল না।

শ্রীকৃষ্ণকে তিনি বললেন, "হে কৃষ্ণ! যত সর্বনাশ সবেরই মূল তুমি। তোমারই কূটবুদ্ধি এমন সর্বনাশ ঘটিয়েছে। তুমি বলতে, কৌরব ও পাণ্ডব দুই-ই তোমার কাছে সমান। কিন্তু কাজের বেলা তোমার সে কথা রাখো নি। জেনে রাখো, একদিন তোমারও সর্বনাশ হবে। আজ যেমন কৌরব নারীরা শ্মশানে পড়ে কাঁদছে একদিন তোমার যদু বংশের নারীরাও স্বামী ও ছেলের শোকে এমনি হাহাকার করে কাঁদবে।"

গান্ধারীর কথা সত্য হয়। যদুবংশের লোকেরাও নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারীর এ কথার কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

তারপর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর ছেলেদের একটি একটি করে দেহ খুঁজে বার করে পাশাপাশি রাখা হতে লাগলো। আর বৃদ্ধ রাজা-রানী হাহাকার করে কাঁদতে লাগলেন।

মৃতদেহগুলি পুড়িয়ে সকলে স্নান ও তর্পণের জন্যে গেলেন গঙ্গাতীরে।

"হে কৃষ্ণ! যত সর্বনাশেরই মূল তুমি।..."

কুন্তী এতক্ষণ শান্ত ছিলেন। এবার যুধিষ্ঠিরকে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "বৎস! কর্ণের নামে তর্পণ করো। সে আমার বড় ছেলে—তোমার সহোদর ভাই।"

মায়ের কথা শুনে যুধিষ্ঠির হতভম্ব! যে কর্ণকে তাঁরা মনে করতেন পরম শত্রু, যাঁকে মারতে পেরে তাঁরা খুব আনন্দিত হয়েছিলেন, সেই কর্ণ তাঁদের সহোদর ভাই! যুধিষ্ঠির বড় দুঃখে মা কুন্তী দেবীকে বললেন, "মা, তুমি কেন এমন নিষ্ঠুর হলে? যিনি আমাদের গুরুজন আমাদের দিয়ে কেন তাঁকে বধ করিয়েছো? কুরুরাজ্য কেন এমন করে ছারখার করলে? যদি আগে একবারও কোনমতে জানতে পেতাম!"

যুধিষ্ঠির কর্ণের শোক কিছুতেই ভুলতে পারলেন না। সকলকে নিয়ে এলেন হস্তিনায়। তাঁকে খুব জাঁকজমক করে সিংহাসনে বসানো হলো। বিদুরকে করা হলো প্রধান মন্ত্রী। আর চার ভাইকে দেওয়া হলো এক একটি যোগ্য পদ। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কেও একটি পদে নিযুক্ত করা হলো।

ওদিকে পিতামহ ভীষ্ম তখনও মরেন নি। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শরশয্যায় শুয়েছিলেন। আগেই বলেছি, তিনি ইচ্ছা না করলে কেউ তাঁকে মারতো না। কিসে তাঁর মৃত্যু হবে সে কথা তাঁরই কাছ থেকে জেনে নিয়ে অর্জুন যুদ্ধ করতে করতে তাঁর শরীর বাণে বানে ছেয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর শরীরের প্রতি লোমকূপে বাণ বিঁধেছিল। তিনি রথ থেকে পড়ে গিয়ে সেই বাণের ওপরই শুয়েছিলেন। এই ঘটনার আটান্ন দিন পরে এক শুভদিনে, শুভক্ষণে তিনি দেহ ছেড়ে স্বর্গে চলে যান। রাজা যুধিষ্ঠীর সকলকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে উপদেশ শুনতে। ভীষ্মও আদর করে গল্পের ছলে যুধিষ্ঠীরকে উপদেশ দিতে লাগলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন।

রাজা হওয়ার কিছুদিন পর শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস, বিদুর প্রভৃতির পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাবার ব্যবস্থা করলেন। এই যজ্ঞটি যে সে রাজা করতে পারেন না। এতে চাই অনেক টাকা ও অনেক শক্তি। ব্যাসদেবের পরামর্শে টাকার জোগাড় হয়ে গেল। বাকি রইলো চারধারের রাজাদের বশ করা। শরীরে সুলক্ষণ আছে এমন একটি ঘোড়ার কপালে জয়পত্র বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হলো। ঘোড়াটি চললো ইচ্ছামতো। ইচ্ছামতো চলে ঘোড়াটি এক বছর পরে আবার

যখন ফিরে আসবে তখন তাকে কেটে তার মাংস দিয়ে যজ্ঞ করা হবে। পথে যদি কেউ তাকে আটকায় তার সঙ্গে যুদ্ধ করে ছাড়িয়ে নিতে হবে। না হ'লে যজ্ঞ হবে না।

অর্জুন চললেন ঘোড়াটির রক্ষক হয়ে তার সঙ্গে। ঘোড়াটি চলেছে। চলতে চলতে সে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমের সকল রাজ্যেই গেল। প্রত্যেক রাজ্যের রাজা তাকে আটকালেন। অর্জুনকেও তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করে হারিয়ে দিয়ে যজ্ঞের ঘোড়া উদ্ধার করতে হলো। সিন্ধু দেশের রাজা জয়দ্রথের রাজ্যে এসে মারামারি-কাটাকাটি হলো খুব। অর্জুন বহু লোককে মেরে ফেললেন। জয়দ্রথ যে কে তা আগেই বলেছি। তিনি মেরেছিলেন অর্জুনের বীর ছেলে অভিমন্যুকে। তাঁকে মেরেছিলেন অর্জুন।

ঘোড়াটি ঘুরতে ঘুরতে এলো মণিপুরে। মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের ছেলের নাম বভ্রুবাহন। তিনিই তখন মণিপুরের রাজা।

তিনি যখন শুনলেন, তাঁর পিতা অর্জুন এসেছেন তখন খুব নম্রভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

অর্জুন তাঁকে দেখে বললেন, "এখন আমি তোমার বাবা নই, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষক। আমাদের ঘোড়া তোমার রাজ্যে এসেছে। এখন কাপুরুষের মতো হাতজোড় করে থেকো না। যুদ্ধের জন্যে তৈরি হও।"

তারপর পিতা-পুত্রে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। বভ্রুবাহন যুদ্ধ করতে করতে এমন এক বাণ মারলেন যে, অর্জুন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাই দেখে বভ্রুবাহন জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। নাগরাজের মেয়ে উলূপী শেষে নাগলোক থেকে সঞ্জীবনী মণি এনে অর্জুনকে বাঁচিয়ে দিলেন। সকলে সুখী হলেন।

তারপর আরও কয়েক জায়গায় ঘুরে ঘোড়াটি ঠিক এক বছর পরে হস্তিনায় ফিরে এলো। মহারাজ যুধিষ্ঠির খুব ঘটা করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। সকলে তাঁকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হস্তিনাতেই বাস করছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁদের খুব আদর-যত্ন করতেন। এত বুঝি তাঁদের ছেলে দুর্যোধনও করতেন না। তারপর তাঁরা একদিন যুধিষ্ঠিরের মত নিয়ে বনে চলে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে গেলেন কুন্তী, কাকা বিদুর ও সঞ্জয়। তাঁরা গিয়ে কুরুক্ষেত্রে আশ্রম তৈরি করিয়ে বাস করতে লাগলেন। জায়গাটি অতি সুন্দর। চারধারে মুনি ঋষিদের আশ্রম। কিছু দূরে গঙ্গা।

সেখানে তাঁরা কয়েক মাস তপস্যায় কাটালেন। বিদুর সেখান থেকে আরও গভীর বনে গিয়ে কঠোর তপস্যায় মন দিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁকে দেখতে গিয়ে কিছুকাল সেখানে বাস করতে লাগলেন। একদিন দেহ ছেড়ে তাঁর আত্মা স্বর্গে চলে গেল। তিনি মারা গেলে সকলেই কাঁদলেন।

তারপর দুটি বছর কেটে গেল! একদিন মহর্ষি নারদ এসে যুধিষ্ঠিরকে দুঃসংবাদ দিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধীর ও কুন্তী দাবানলে (বনের আগুন) পুড়ে মারা গেছেন। এই দারুন দুঃসংবাদে দুঃখে পাণ্ডবজের বুক ভেঙে গেল। কিন্তু করবেনই বা কী? তাঁরা রাজা-রানী ও মা কুন্তী দেবীর শ্রাদ্ধশান্তি করলেন।

তারপর দিন যায়। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য শাসন করেন। এই ভাবে ছত্রিশটি বছর কেটে গেল।

এই সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও দেবর্ষি নারদ দ্বারকা নগরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একদিন দেখা করতে এলেন। পরে কয়েকটি দুষ্টু ছেলে তাদের বিদ্রূপ করলো। তাতে তাঁরা অভিশাপ দিলেন, "তোদের সর্বনাশ হবে। কৃষ্ণ ও বলরাম ছাড়া তোদের যদুবংশের আর কেউই রক্ষা পাবে না। সবাই মুষলের আঘাতে মরবি।"

এই কথা শ্রীকৃষ্ণও শুনলেন। কিন্তু তিনি একটুও অস্থির হলেন না। ঋষিরা যা বলেছিলেন, তাই একদিন ঘটলো। যদুবংশের লোকেরা এতদিন প্রভাত-তীর্থে গিয়ে মদ খেয়ে এমন হলো যে তাদের ভাল-মন্দ জ্ঞান রইলো না। তারা মারামারি করতে লাগলো। ক্রমে সেটা একটা যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। তাতে বহুলোক মারা গেল। শ্রীকৃষ্ণের ছেলে প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকি মারা গেলে তিনি রাগের বশে সকলকেই মেরে ফেললেন। তারপর গেলেন দাদা বলরামের খোঁজে।

খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখেন, বলরাম জঙ্গলের মধ্যে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারথি দারুককে পাঠালেন হস্তিনা থেকে অর্জুনকে আনতে। দারুক তৎক্ষণাৎ হস্তিনায় চললেন। আর শ্রীকৃষ্ণ গেলেন বাড়িতে স্ত্রীলোকদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে। তারপর জঙ্গলে বলরামের কাছে ফিরে এসে দেখেন, একটা সহস্রফণা সাপ বলরামের মুখ থেকে বার হয়ে সমুদ্রের দিকে চলেছে। শ্রীকৃষ্ণ তাই দেখে বুঝতে পারলেন, বলরাম দেহ ত্যাগ করে স্বর্গে চলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই দেখে মনে বড় ব্যথা পেলেন।

তিনি সেখান থেকে আরও গভীর বনে গিয়ে একটা গাছতলায় বসে ভাবতে লাগলেন,

এখন কী করা উচিত। এমন সময়ে সেখানে এলো এক ব্যাধ। সে শ্রীকৃষ্ণকে হরিণ ভেবে তাঁকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লো। তীর গিয়ে বিঁধলো শ্রীকৃষ্ণের গায়ে। তাড়াতাড়ি তার শিকারের কাছে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে ভয়ে একেবারে পাথর হয়ে গেল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধকে অভয় দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

অর্জুন দারুকের সঙ্গে এলেন দ্বারকায়। কিন্তু হায়। সে দ্বারকা আর নেই। তা আজ কৃষ্ণশূন্য। দ্বারকার অবস্থা বড় শোচনীয়। কৃষ্ণের অভাবে অর্জুনের চোখে সব অন্ধকার।

তারপর অস্থির মনে গেলেন ব্যাসদেবের কাছে। তাঁর কাছে দুঃখের কথা বলতে মহর্ষি ব্যাস বললেন, "বৎস! এই পৃথিবীতে তোমাদের কাজ ফুরিয়েছে! এখন পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে যাবার জন্য তৈরি হও।"

অর্জুন ব্যাসদেবের কথা শুনে গেলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠির দ্বারকার খবর শুনে আর বেঁচে থাকতে চাইলেন না। বললেন, "আমি মহাপ্রস্থান করবো।" তাঁর কথা শুনে চার ভাই ও দ্রৌপদী বললেন, "আমরাও আপনার সঙ্গে যাবো।"

তখন পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পাঁচভাই ও দ্রৌপদী হস্তিনাপুর থেকে বার

হলেন। সেই সময়ে একটি কুকুর এসে তাঁদের সঙ্গ নিল। প্রজারাও এসে তাঁদের সঙ্গে চলতে লাগলো। তাঁদের সঙ্গে খানিক দূর গিয়ে তারা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে গেল।

পঞ্চপাণ্ডব চলেছেন। সকলের আগে যুধিষ্ঠির, তার পরে ভীম-অর্জুন, তাঁদের পরে নকুল-সহদেব, তাঁদের পর দ্রৌপদী। সঙ্গে চলেছে কুকুরটি। পূর্ব দিকে অবিরাম চলে তারা এলেন সাগর-কূলে।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধকে অভয় দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

এখান থেকে তাঁরা ক্রমশঃ চলতে লাগলেন উত্তর দিকে। চলতে চলতে, তাঁরা পেঁছিলেন হিমালয় পাহাড়ে। কতকদূর উঠলে দ্রৌপদীর হাত-পা অসাড় হয়ে এলো। তিনি পড়ে গিয়ে প্রাণ হারালেন। সশরীরে স্বর্গে যেতে পারলেন না।

তারপর খানিক উঠে সহদেব পড়ে প্রাণ হারালেন। তিনিও সশরীরে স্বর্গে যেতে পারলেন না। কারণ তিনি মনে করতেন, সকলের চেয়ে জ্ঞানী তিনি।

আবার সকলে উঠছেন। আরও খানিক উঠে নকুল পড়ে গেলেন। তাঁরও সশরীরে স্বর্গে যাওয়া হলো না। কারণ তার বড় অহংকার ছিল যে, তার মতো সুপুরুষ আর কেউ জগতে নেই।

তারপর আরও খানিক উঠবার পর অর্জুন পড়লেন। তিনিও সশরীরে স্বর্গে যেতে পারলেন না। কারণ, একদিনেই সমস্ত শত্রুকে মেরে ফেলবেন, এই প্রতিজ্ঞা তিনি রাখতেপারেন নি।

তারপর পড়লেন ভীম। তিনি পড়তে পড়তে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ! আমার পড়বার কারণ কী?" যুধিষ্ঠির বললেন, "বৎস! তুমি মনে করতে তোমার মতো

পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী চলেছেন মহাপ্রস্থানে। সঙ্গে চলেছে সেই কুকুরটি।

গায়ের জোর আর কারো নেই। এই অহঙ্কারেই তোমার এ দশা হলো।" কাজেই তাঁরও সশরীরে স্বর্গে যাওয়া ঘটলো না।

যুধিষ্টির উঠছেন একা। সঙ্গে উঠছে সেই কুকুরটি। সে ছাড়া সঙ্গী আর কেউ নেই। খানিক দূর উঠবার পরই পুষ্পক রথ নিয়ে এলেন, দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "মহারাজ! তুমি এখনই রথে উঠে স্বর্গে যাও।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "দেবরাজ! আমার চার ভাই আর দ্রৌপদীকে ছেড়ে স্বর্গে যেতে ইচ্ছা নেই।"

দেবরাজ বললেন, "তোমার চার ভাই আর দ্রৌপদী তোমার আগেই স্বর্গে গেছে। তুমি সশরীরে স্বর্গে গিয়ে তাদের দেখা পাবে।"

তখন যুধিষ্ঠির বললেন, "দেবরাজ! এই কুকুরটি আমার বড় ভক্ত। এ অনেক দিন আমার সঙ্গে আছে। একেও আমার সঙ্গে স্বর্গে যেতে আজ্ঞা দিন।"

দেবরাজ বললেন, "কুকুর অপবিত্র জন্তু। অতএব তুমি এখনই ওকে ত্যাগ করো। তুমি সকলকেই ত্যাগ করেছো। এই কুকুরটাকে ছাড়তে তোমার বাধা কী?"

যুধিষ্ঠির বললেন, "আমার মতে ভক্তকে, যে আমার শরণ নিয়েছে তাকে ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত নয়। তাতে পাপ হয়। এ না ডাকতেই আমার সঙ্গ নিয়েছে। একে ছেড়ে আমি স্বর্গে যেতে চাই না।"

এমন সময়ে সেই পথের কুকুরটি ধর্মের রূপ ধরে যুধিষ্ঠিরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "বৎস! আমি ধর্ম। তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যে কুকুরের বেশ ধরে তোমার সঙ্গে

"বৎস! আমি ধর্ম।"

এসেছি। এখন বুঝলাম তুমি খুব ধার্মিক, খুব বুদ্ধিমান আর দয়ালু। কুকুরের আশ্রিত মনে করে তার জন্যে স্বর্গের রথও ফিরিয়ে দিচ্ছ। তোমার সমান ধার্মিক স্বর্গেও নেই।"

এই কথা ব'লে ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে সেই পুষ্পক রথে চড়িয়ে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে গেলেন।

—শেষ—
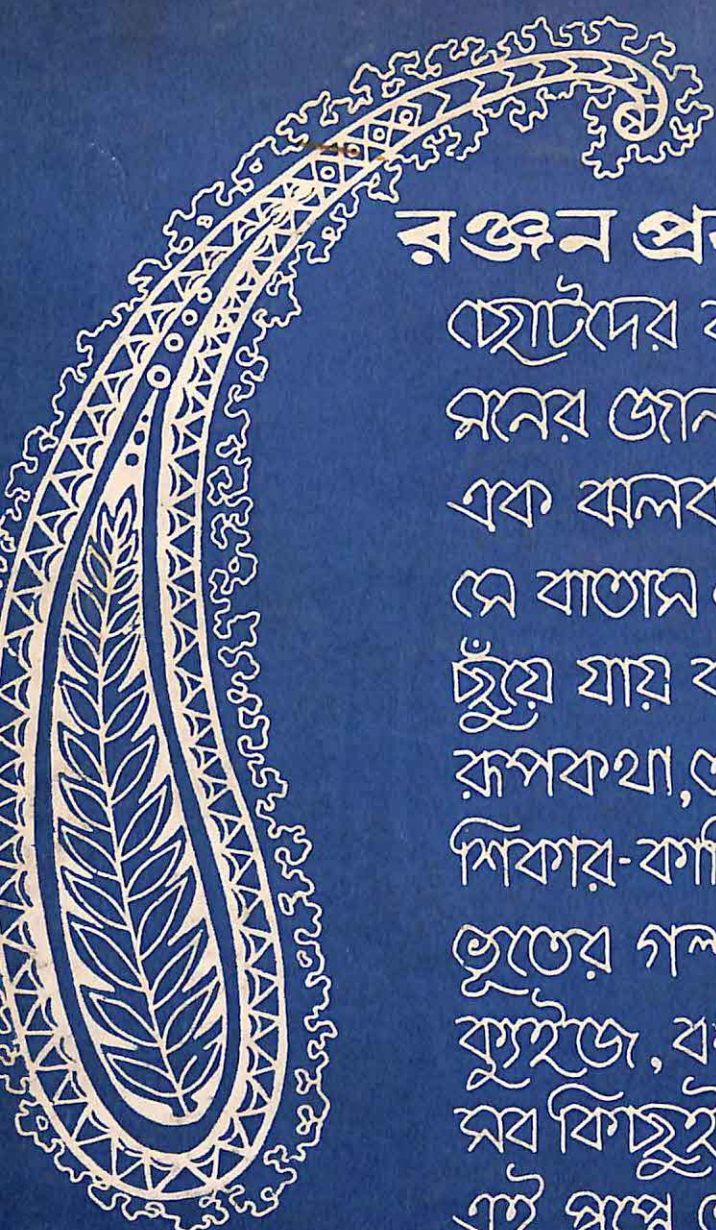
ছোটদের বই মানেই
মনের জানলা দিয়ে
এক ঝলক খুশির বাতাস
সে বাতাস ছোটদের মন মাতিয়ে
ছুঁয়ে যায় বড়দেরও।
রূপকথা, অ্যাডভেনচার, জীবনী,
শিকার-কাহিনী, জ্ঞান-বিজ্ঞান,
ভূতের গল্প, হাসির গল্প, খেলা,
কুইজ, ক্লাসিকস, ছড়া,
সব কিছুই ছড়িয়ে আছে
এই স্বপ্নে ভরা বইয়ের মেলায়।
আর সে বইয়ের পাতায় পাতায়
মন ভরানো রঙীন ছবির আলপনা,
হাতে নিলেই খুশির রঙে
মন রঙীন হয়ে ওঠে॥